ক্যাবিলন কথকতা

১৬তম সংখ্যা
১৩ ডিসেম্বর ২০২১

BABYLON

TRENDZ
BURN FAT
www.trendzbd.com
TrendzBangladesh

ডিসেম্বর ১৩, ২০২১

সম্পাদক
এসএম এমদাদুল ইসলাম

সহ-সম্পাদক
রুমানা আক্তার

বিশেষ সহযোগিতা
আরিফ হোসেন

প্রচ্ছদ
মাহবুব শিপু

অলংকরণ
শ্রী সাগর কুমার

সার্বিক শিল্প নির্দেশনা
এসএম এমদাদুল ইসলাম
রুমানা আক্তার

মুদ্রণ
অক্ষর প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিসার্স
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
৮৬২২৯০১, ০১৯৩৬-১৫৬১০০

BABYLON

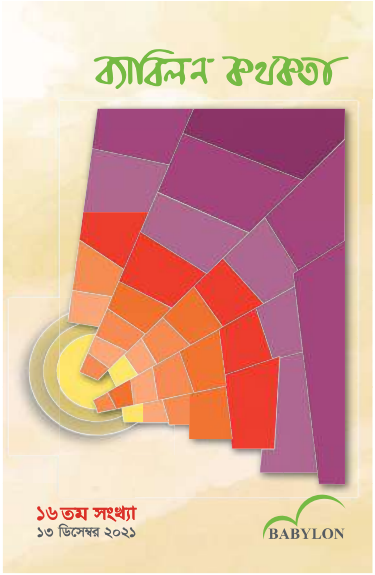

সূচিপত্র

শুভেচ্ছা বাণী			৪
সম্পাদকীয়			৬
সূর্য তখন মধ্যগগন	:	সানজিদা আফরোজ তিথি	১০
আমার ইংরাজি গ্রামার বই	:	কাজী মহিউদ্দিন	১২
মুত্যু উপত্যকার কাব্য	:	এস এম আরিফ রাজ্জাক	১৬
কিডনি সমস্যা– এক নিঃশব্দ ঘাতক	:	ডা. আতিকাহ্ ইসলাম চৌধুরী	২০
নিয়তির খেলা	:	বিউটি খাতুন	২২
স্বপ্নপ্রদীপ	:	সাদিয়া আলম	২৬
স্মৃতিকাল	:	ইথার আখতারুজ্জামান	২৮
না বলা কথা	:	শরীফ রাজ	২৯
প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন (ওডি)- গন্তব্য নয়, একটি যাত্রা	:	মো. মিনারুল আকবর	৩০
অপ্রস্তুত	:	প্রদীপ কুমার দত্ত	৩৯
পটু মিয়ার খেল	:	জামাল হোসেন	৪২
এ এক ভয়ার্ত পৃথিবী– তবুও যেন নেই মানুষের			
স্বভাবের পরিবর্তন	:	মুহাম্মদ সাইফুল হক	৪৫
জয়ীতাদের গল্প	:	উম্মে সালমা ডালিয়া	৪৮
ষোড়শী কথকতা	:	সাইদুর রহমান	৫৩
পুষ্পকথা	:	মো. সোহেল রানা	৫৪
তুমি	:	মো. সাইদুর রহমান	৫৬
বাস্তবতা	:	ডা. মো. দিদারুল করিম	৫৭
না ছাড়িব আশা	:	কাজী এএম তুষার আলম	৫৮
ক্লেপটোমেনিয়া	:	রুমানা আক্তার	৬৪
সমুখে সুন্দর আগামী দিন	:	এম এম তোফাজ্জল হোসেন	৬৮
চীনে চার	:	চৌধুরী মঈদুর রহমান	৭০
মুহূর্ত	:	মো. গোলাম মাওলা	৭৫

বাবাকে মনে পড়ে	:	মো. খায়রুল বাশার	৭৬
স্মৃতির নগরী	:	মো. আসমাতুল্যাহ (গালিব)	৭৮
অন্ধকারে ছুটে চলা	:	মো. ফরহাদ হোসেন নির্জন	৭৯
বাড়িওয়ালি	:	এসএম এমদাদুল ইসলাম	৮১
বিভ্রম	:	মো. মহসীন	৯০
২০১৯– হাসপাতালময় এক বছর	:	কাজী মাইনুল হোসেন	১০২
মর্নিং মিটিং	:	নাজমুল হুদা আহমদ	১০৮
বৃষ্টিমুখর দুপুর	:	আরিফ হোসেন	১১০
ফটো অ্যালবাম			১১৭-১১৮

শুভেচ্ছা বাণী

ইলাহী দাদ খান

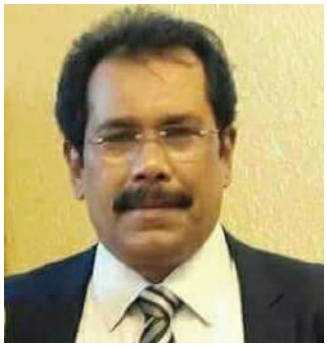

ব্যাবিলন গ্রুপ সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান নয়। এটি একটি রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান। এখানে পোশাক তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। কিন্তু আমি প্রতিবারই এখানে এসেছি সাহিত্যের সাথে সম্পৃক্ত অনুষ্ঠানে অংশ নেবার জন্য। এমন একটি যন্ত্রচালিত কারখানার সাথে সাহিত্যের কি কোন সম্পৃক্ততা থাকতে পারে? পারে এবং এটি সম্ভব। এখানেই স্বস্তির নোঙর। যে মানুষগুলো এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তারা যন্ত্র নিয়ে কাজ করলেও নিজেরা যন্ত্র– মানব হয়ে যাননি। মানবজীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভবগুলো এরা হৃদয়ে গভীরভাবে ধারণ করেন। শুধুমাত্র ধারণই করেন না। সুযোগ পেলেই সেগুলোর প্রকাশ করেন শিল্পিত সৌরভে। আর এর প্রাণপুরুষ এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্ণধার জনাব এসএম এমদাদুল ইসলাম। তাঁর উৎসাহে একদল সাহিত্যানুরাগী মানুষ মনের আকুতি প্রকাশের লক্ষ্যে একটি মঞ্চের সন্ধান পেয়েছেন। আর এই মঞ্চই হলো ব্যাবিলন কথকতা। এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আরো যে কয়জন নীতিনির্ধারক আছেন তাঁরাও এই স্রোতে অবগাহনে পিছিয়ে থাকেননি। সাহিত্যের এই কাজে তাদের সস্নেহ প্রশ্রয় সবাইকে প্রেরণা জোগায়।

হৃদয়ের গভীরে লালিত সাহিত্যমনকে প্রকাশ করার নিমিত্তে প্রতি বছর তাঁরা এই সংকলনটি বের করেন। কোভিড অতিমারির গভীর দুঃসময়েও এই সংকলন প্রকাশ থেমে থাকেনি। সংকলন প্রকাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে জেনেছি কতোটা বিরূপ পরিস্থিতির মাঝে দাঁড়িয়েও তারা এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যান। এরা দুর্দমনীয়, প্রত্যয়দীপ্ত এবং দৃঢ়সংকল্পের মানুষ। সাহিত্য আমার ভালোলাগার প্রিয় জমিন। সংকলনটি পাবার পর আমি প্রথমেই সেটি আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলি। পরে পড়বো বলে আমার সংগ্রহে প্রচুর বই জমা হয়ে থাকে। নিয়ম করে প্রতিদিন তিন ঘণ্টা বই পড়ি। তথাপি কিছু বই পড়ার পালা আসতে আসতে কখনো বছর পেরিয়ে যায়।

কিন্তু এই সংকলনটি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। যেদিন পাই সেদিনই পড়ে শেষ করে ফেলি। এবারও যথারীতি যেদিন পেয়েছি সেদিন রাতেই সবগুলো লেখা পড়ে ফেলেছি। এমন নয় যে পড়ার জন্য পড়ে গেছি। ভালো লেগেছে বলেই পড়েছি। মোট ৪৩ টি লেখায় সমৃদ্ধ এই

সংকলন। এর মধ্যে একটি শুভেচ্ছাবাণী এবং একটি সম্পাদকীয় রয়েছে। পরিণত মননের পরিচায়ক এই সম্পাদকীয়টি সংকলনের মূল সুরটা ধরিয়ে দিয়েছে। খুব সাধারণ কথা দিয়ে সাজানো। কিন্তু প্রতিটি শব্দে এবং প্রতিটি বাক্যে সহজ সরল অকপট মনের প্রকাশ মন ছুঁয়ে যায়। অবশিষ্ট ৪১ টি লেখার মধ্যে ২১ টিই কবিতা। এগুলো কবিতার শর্ত পূরণ করে কিনা সেই প্রসঙ্গে না গিয়ে একটি কথাই শুধু বলতে পারি যে একজন মানুষের গভীর অনুভবের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশই হলো কবিতা। আসলে কবিতার কোন শর্তও নেই, সংজ্ঞাও নেই। কবিতাগুলো পড়ে খুব ভালো লেগেছে।

ছোট গল্প লেখা সহজ কাজ নয়। সৃজনী চিন্তা না থাকলে সার্থক ছোট গল্প লেখা সম্ভব নয়, যেমন সহজ নয় প্রবন্ধ লেখা। ছোট গল্পে ক্ষুদ্র পরিসরে একটি ঘটনাকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে হয়। আর প্রবন্ধ হলো জ্ঞানের সুবিন্যস্ত প্রকাশ। ভালো জ্ঞান না থাকলে ভালো প্রবন্ধ লেখা যায় না। স্মৃতিচারণমূলক লেখাগুলোতে অনেক প্রাসঙ্গিক তথ্য সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। পরিবেশ এবং সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে ভালো কয়েকটি প্রবন্ধ রয়েছে। এগুলো নিয়ে ভাবার মতো লোকজন যে এই প্রতিষ্ঠানে রয়েছেন সেটি দেখে ভালো লাগলো।

এবারো আরেকটি সংকলন বেরুচ্ছে। আশা করি এটিও পূর্বের সংকলনগুলোর মতো সুন্দর লেখায় সমৃদ্ধ হবে। অনেক শুভেচ্ছা রইলো।

সম্পাদকীয়

প্রতিবছর এই সময়টা এলে একটা চাপ অনুভব করি এই কলমে কী লিখবো, কতোটুকু লিখতে পারবো, বরাদ্দ পাতা ভরাতে পারবো কি? এই সব ভাবি। তবে এবার ভাবনাটা ভিন্ন। ভাবছি এবার যা লিখা দরকার, সম্ভব, তা লিখার জন্য যথেষ্ট পরিসর মিলবে কি?

কোভিড-১৯ ভাইরাসের আক্রমণের ধরনটা ঠিক রূপকথার কোনো দৈত্যের মতোই। সময়ে সময়ে চেহারা পরিবর্তন করে নতুন বীভৎসতা নিয়ে আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়েছে অভিনব এই রোগটি। মনে করেছিলাম ২০২০ এর পরে এর দাঁত ভোঁতা হয়ে যাবে, স্বাভাবিক পরিক্রমায় ফিরে যেতে পারবে আমাদের এই পৃথিবীটা। সেটা না হয়ে ২০২১ এর দ্বিতীয় ভাগে এসেও কোভিড-১৯ তার পেশিশক্তি দেখাতে থাকলো। নতুন করে কঠোর লকডাউন হলো দেশে। আকাশ দেখে ঝড় কেটে গেছে ভেবে বাইরে বের হয়ে নতুন করে আচমকা ঝড়ের মধ্যে পড়ার মতো একটা অবস্থা।

আমি এই পত্রিকার বিগত সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলেছিলাম ২০২০ হলো আমাদের টিকে থাকার সংগ্রামের বছর, ২০২১ পুনর্গঠনের এবং ২০২২ নতুন করে সমৃদ্ধির পথে যাত্রা। ২০২১ এর পুনর্গঠন সুন্দর হতে পারতো যদি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বছরের মাঝখানে এসে করোনার অন্তিম থাবার খপ্পরে আমরা আবার না পড়তাম। হ্যাঁ, আমার আশা, গত জুন জুলাইয়ের করোনা বিপর্যয়টাই কোভিড-১৯ ভাইরাসের শেষ, এদেশে বা গোটা বিশ্বে এখন এটা একটা পরাজিত দুর্বৃত্তশক্তির নাম, স্থান তার ইতিহাসে। আমরা এই দুষ্টব্যাধিটিকে হারিয়ে দিয়েছি। আমার বিশ্বাস এমনই।

যাই হোক, করোনা ভাইরাস আমাদের কাছ থেকে নিয়েছে যেমন, দিয়েছেও তেমন। করোনা বিপর্যয়ের শকওয়েভ বা আফটারম্যাথ আমরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি বটে, তবে পরাজিত এই বিশ্ব শত্রুর প্রস্থান লগ্নে বুঝতে পারছি আমরা কতোটা রেজিলিয়েন্ট হয়েছি, চূড়ান্ত বৈরি পরিবেশে টিকে থাকার কৌশল ও দক্ষতা আমরা সবাই অর্জন করেছি। বাংলাদেশের এই গার্মেন্ট শিল্পটি টিকে যাবার পিছনে গত বছর সরকারের অতি সময়োচিত পদক্ষেপ অন্যতম একটা কারণ ছিলো। আমাদের মতো একটা গরিব দেশের জন্য অতিসাহসী একটা পদক্ষেপ ছিলো সেটা। একটা গরিব দেশের সরকারের পক্ষ থেকে ইন্ডাস্ট্রিকে অতি সহজ শর্তে আর্থিক ঋণ সুবিধা প্রদান একটা অসাধারণ প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্তও ছিলো বটে, যা পরে সারা বিশ্বে নন্দিত হয়েছে।

ভাঙাগড়ার ভেতর দিয়ে একটু এগিয়ে আবার একটু পিছিয়ে পড়ে ব্যাবিলনের নতুন-পুরোনোর দলটা ক্রমে ক্রমে থিতু হয়ে এসেছে। এখন তারা ডেলিভার করবার জন্য অতীতের যে কোনও সময়ের চাইতে অধিক যোগ্যতা নিয়ে প্রস্তুত। এই দলটি বয়সে নবীন, অভিজ্ঞতায় সাবালক, উদ্যমে অদম্য, আধুনিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ, প্রযুক্তি গ্রহণ ও তার প্রয়োগে আস্থাশীল।

চলতি বছরে বা ২০২১ সালে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনার কোনও শেষ নেই।

আমাদের অবনী নীট নিয়ে একটা পরীক্ষা আমরা চালিয়েছি। এক বন্ধু কোম্পানির আগ্রহে তাদের সাথে বিজনেস পরিচালনার একটা যৌথ মহড়া আমরা করেছি প্রায় ছ'মাস ধরে। মার্চের শেষ থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত সেই যুগ্ম প্রচেষ্টাটি চলেছে। আমরা উভয় পক্ষ এক বুক আশা নিয়ে মাঠে নেমেছিলাম সবটুকু আন্তরিকতা নিয়ে। উভয় কোম্পানি যার যার রিসোর্স মাঠে নামিয়েছিলো। কিন্তু তারপরও আশানুরূপ ফলাফল অর্জিত হয়নি। ফলে যৌথ প্রজেক্টটি সঙ্গত কারণেই আর এগোয়নি। আমরা আবার আগের অবস্থানে ফিরে গেছি। পরে বুঝলাম সেই যৌথ ব্যবস্থাটিকে না আমাদের ক্রেতারা ভালো চোখে দেখেছে, না দেখেছে অবনীর আপামর কর্মচারী ও কর্মী বাহিনী। সেই যৌথ পথচলার শুরুতেই বাজারে বেশ কিছু গুজব ছড়িয়েছিলো যে আমাদের কোম্পানি আমরা বিক্রি করে ফেলেছি। এরকম গুজব, যার কোনও বাস্তব ভিত্তি ছিলো না, তা খুবই খারাপ হয়েছে আমাদের ভাবমূর্তির জন্য। অনেক বায়ার তাতে অস্বস্তিতে পড়েছে। যাহোক, সব ভালো যার শেষ ভালো। আমার মতে এই যৌথ প্রচেষ্টাটি থেকে কিছু লাভও আমাদের হয়েছে। অবনী নীটের সার্বিক পরিচালনায় আমাদের আগেকার দুর্বলতার বেশ কিছু আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে। আমার বিশ্বাস অবনী টিম এবার নতুন উদ্যমে দলগতভাবে কাজ করে সেই সব দুর্বলতা ঝেড়েমুছে ফেলতে পারবে। খারাপ করার আর কোনও সুযোগ এদের নেই। আগের চাইতে ভালো করতে না পারলে সবাই ভাববে যৌথ উদ্যোগ থেকে সরে আসাটা আমাদের ভুল হয়েছে। সেটা হবে অবনীর বর্তমান টিমের জন্য একটা পরাজয়। সেটা নিশ্চয় তারা হতে দেবে না।

এ বছর আমাদের গ্রুপ সিইও কাজী মহিউদ্দিন ব্যাবিলনের সাথে তার অ্যাসোসিয়েশনের তিন বছর দুই মাস পূর্ণ করে তার পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্টের জন্য অন্যত্র চলে গেছে। গত অক্টোবর ছিলো তার শেষ মাস আমাদের সাথে। আমাদের প্রথম গ্রুপ সিইও হিসেবে মহিউদ্দিনের সাফল্যের দিকটাই ভারী। ব্যাবিলন মহিউদ্দিনকে করোনা দুঃসময়ে তার বিচক্ষণ ভূমিকা ও ৩৬০ ডিগ্রি নজরদারি, টিম মেম্বারদের সকলকে উজ্জীবিত রাখা, দিকনির্দেশনা দিয়ে যাওয়া – এসব কোনও দিন ভুলতে পারবে না। একজন সফল নেতার যে পরিচয় সে তখন দিয়েছে তা ব্যাবিলন কৃতজ্ঞতার সাথেই মনে রাখবে। একটা চমৎকার প্রফেশনাল টিম তৈরির ভিত্তিটা সে তৈরি করে দিয়েছে। সুখের কথা মহিউদ্দিন আরিফ ভূঁইয়ার মতো একজন যোগ্য কাণ্ডারির কাছে তার হালটি দিয়ে যেতে পেরেছে। আমি মনে করি ও বিশ্বাস করি মহিউদ্দিন আমাদের দেশের সিইওদের মধ্যে প্রথম সারির একজন। ওর সাথে তিন বছরের বেশি সময় ধরে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে একথাটা আমি জোর দিয়েই বলতে পারি। মহিউদ্দিনের সাফল্য কামনা করি, সাথে তার অসমাপ্ত কাজ নিয়ে ব্যাবিলনের অগ্রযাত্রার মশালবাহী হিসেবে আরিফের সাফল্যও আমাদের একান্ত কাম্য। আরিফ ভালো করবে এর জোরালো সম্ভাবনা তার চোখে মুখে চলায় বলায় দেখতে পাই। মাত্র এক মাস দশদিন পার করেছে সে। (১১ নভেম্বর, ২০২১)।

আরিফ ভূঁইয়াকে ব্যাবিলন পরিবারে স্বাগতম। কাজী মহিউদ্দিনের জন্য তার পরবর্তী

পথচলায় শুভেচ্ছা। ব্যাবিলনের বাইরে অবস্থান করেও সে থাকছে ব্যাবিলনের অতি আপন একজন শুভাকাঙ্খী হয়ে।

এ বছর ব্যাবিলন পরিবার থেকে কিছু সদস্যের বিয়োগ হয়েছে, যোগ হয়েছে কিছু নতুন মুখ – উল্লেখযোগ্যভাবে মানব সম্পদ বিভাগ, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, সাপ্লাই চেইন বিভাগ তার মধ্যে অন্যতম। বাকি উল্লেখযোগ্য নতুন মুখ এসেছে নীট ফ্যাক্টরির অপারেশনে, অবনী নীটের নিটিং শাখায়, ডায়িং-ফিনিশিং ও অবনী নীট ওয়্যারের মার্কেটিং-মার্চেন্ডাইজিং বিভাগে। এদের প্রত্যেককে যথেষ্ট প্রত্যয়ী ও যোগ্য মনে হয়। দেখা যাক, ২০২২ এর শুরুটা সবাই মিলে কেমন করে। আমাদের অনেক ক্রেতাও মুখ চেয়ে আছে তাদের।

কোভিড-১৯ পালাতে শুরু করেছে তা বোঝা যায় গত বছর ঝিমিয়ে পড়া, গুটিয়ে যাওয়া কাস্টমারদের বর্তমান চাঞ্চল্য দেখে। হঠাৎ করে সঙ্গত কারণেই কাজের চাহিদা বেড়েছে অনেকটা রাতারাতি। ফলে ইন্ডাস্ট্রির অনেকের মতো আমাদেরকেও চট করে ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির কসরত করতে হয়েছে, হচ্ছে। একটা নতুন ফ্যাক্টরি বিল্ডিং লিজ করে সেখানকার সকল মেশিন কিনে নেবার সব কিছু চূড়ান্ত হয়ে এলেও শেষ পর্যন্ত সেই কোম্পানির মালিকের খামখেয়ালি মনোভাবের জন্য তা আর হয়নি। হলে আজ বেশ উপকার হতো আমাদের। একটু এগিয়ে থাকতাম। যাই হোক, একটা দরজা বন্ধ হলে আরেকটা খোলে বা খুলে নিতে হয়। আমাদের ট্রাউজার ফ্যাক্টরির জন্য নিজস্ব বিল্ডিং সম্প্রসারণের কাজ চলছে পুরোদমে। ইতোমধ্যে সেখানে আমরা প্রোডাকশন লাইন বাড়াতে পেরেছি চারটি। আরও দুটি বাড়বে সহসা। আগামী বছরটা শেষ হতে হতে আমরা সেখানে আরও লাইন বাড়াতে পারবো। আশা করছি ২০২৩ এর মধ্যে ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার ফ্যাক্টরি তার গতবছরের ক্যাপাসিটির আড়াইগুণে উন্নীত হতে পারবে, আর ফ্যাক্টরিটি হবে আধুনিকতা, ভবননিরাপত্তা ও কমপ্ল্যায়েন্সের দিক থেকে প্রথম শ্রেণির একটি। দেখতেও হবে বেশ দৃষ্টিনন্দন। এই বিল্ডিং প্রজেক্টের দেখভাল করছেন বোর্ড অব ডাইরেক্টরস থেকে সালাম সাহেব। তাঁর সক্রিয় তত্ত্বাবধানে কাজে পিছিয়ে পড়ার কোনও সুযোগ নেই।

বাড়তে যাচ্ছে আমাদের লন্ড্রি ক্যাপাসিটিও, সাথে মেশিনারির কিছু আধুনিকীকরণও হতে যাচ্ছে ইউনিটটির বড়ো পরিসরে পুনর্বাসনের সময়। এসব ঘটতে পারবে ২০২২ এর প্রথম অর্ধেকের ভেতরেই। নতুন মেশিন আসছে, আনুষঙ্গিক কাজ চলছে।

হেড অফিসের একটা চেহারা তৈরি হয়েছে অবশেষে। অফিস বন্ধ না করেও মস্ত ঝামেলার ও চ্যালেঞ্জের কাজটা অবশেষে মোটামুটি শেষ হয়েছে। আমাদের চোখের সামনে হয়েছে বলে পরিবর্তনটা হয়তো অনেকেই আমরা ভালো করে বুঝিনি। অনেকদিন পরে যারা বাইরে থেকে আমাদের অফিসে আসছেন পরিবর্তন তাদের চোখে লাগছে। এই সব গেস্টদের মুগ্ধতা দেখে আমার ভালো লাগে, সার্থক হয় সংশ্লিষ্ট সকলের পরিশ্রম। এখানে বড়ো করে নাম আসে রুমানা আক্তারের।

এই রুমানা আক্তার এক বিস্ময়। একটি শিশুসন্তান নিয়ে যৌথ পরিবারে বসবাস করেও কোনও মেয়ে যে এভাবে নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে পারে এরকম উদাহরণ এদেশেই আছে

তা রুমানাকে না দেখলে আমার বিশ্বাস হতো না। মেয়েটি কোন জিনিসটা দেখছে না সেটা বলাই কঠিন।

করোনার পরে নতুন দুটো বড়ো ঝুঁকি মাথায় করে ইন্ডাস্ট্রি হাঁটছে, নুয়েও পড়ছে। বিশ্বব্যাপি বস্ত্রশিল্পের প্রধান কাঁচামাল তুলার দাম বেড়েছে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ, ফলে সুতার দামে আগুন লেগেছে (আগে থেকে লাগা কন্টেইনার জট ও তার অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি তো আছেই)। সেই আগুনে ইন্ধন যোগাচ্ছে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি। সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ার অবস্থা। এতোগুলো অড কবে এরকম এক সাথে হয়েছিলো মনে নেই। শুনতে পাই এখনও নাকি কেউ কেউ নতুন করে গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি খুলছেন। এদের যারা জেনে বুঝে করছেন তাদের উদ্দেশে আমি আমার টুপি আলগা করে দেই, যারা না বুঝে, তাদের জন্য আমার শুভেচ্ছা।

গতবছর যেহেতু পেরেছিলাম সেই পটভূমিতে তাই এ বছর ব্যাবিলন কথকতা প্রকাশে কোনও বিশেষ শঙ্কা ছিলো না। তবে প্রকাশের লেবার পেইনটা ঠিকই ছিলো। এই পেইনটা প্রতিবছর নিশ্চিত করে এর লেখক লেখিকারা। মাহমুদ ব্যাবিলন ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে রুমানার হাতে দায়িত্ব গুছিয়ে দিয়ে আমার নিজের তেমন ভাবনা বা দুর্ভাবনা নেই। যে কোনও সঙ্কট অতি দক্ষতার সাথে শেষ পর্যন্ত মেয়েটি কী করে যেন সামলে নেয়। রুমানা এখন এমন পর্যায়ে নিজেকে নিয়ে গেছে যে সেখানে ওকে আর ঘটা করে প্রশংসা করার দরকারই পরে না।

প্রকাশনার সঙ্গে জড়িতদের আলাদাভাবে ধন্যবাদ দেবার পরিসরটা রাখা গেলো না এবার। আশা করি এতে করে মাহবুব শিপু, আরিফ, মশিউর, ব্যাবিলন এগ্রিসায়েন্সের সাগর কুমার সহ অন্যরা কিছু মনে করবে না।

কোভিড ঝুঁকি মাথায় করেও গত সংখ্যার মোড়ক উন্মোচনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন আমাদের বিশেষ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী জনাব ইলাহি দাদ খান। তাঁর শুভেচ্ছা বক্তব্যে সংশ্লিষ্ট সবার অনুপ্রাণিত না হবার কোনও কারণ নেই। চলতি বছরটা তাঁর জন্য ভালো যায়নি শারীরিকভাবে। অবশ্য কোভিড-১৯ সহ আরও কিছু বড়ো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আজ তিনি একজন অপরাজিত যোদ্ধা। ওঁর জন্য আমাদের সবার শুভকামনা।

বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা সবাইকে, সাথে ২০২২ এর নতুন দিগন্তে বিজয় পতাকা উড়াবার আহবান।

স্বাগত ২০২২! তোমাকে আমরা স্বার্থকতা দেবো, বিশেষভাবে চিহ্নিত করে দেবো।

এসএম এমদাদুল ইসলাম
সম্পাদক
১৩ ডিসেম্বর ২০২১

সূর্য তখন মধ্যগগন

সানজিদা আফরোজ তিথি
জুনিয়র ওয়েলফেয়ার অফিসার
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

গতকাল রাতে প্রচণ্ড ঝড় হয়েছে। ভয় পেয়ে মায়ের কোলের কাছে গুটি পাকিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে অবু। সকালে ঘুম থেকে উঠেই দোর খুলে উঠানে আসে সে। তার প্রিয় জামরুল গাছটা আগা থেকে কাণ্ড বরাবর ভেঙে আছে। ঠিক যেন মাটির দিকে ঝুঁকে একটা বল উঠানোর চেষ্টা করছে গাছটা। অবুর চোখের কোণে একটা সূক্ষ্ম জলবিন্দু চিকচিক করে ওঠে, কিন্তু গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে না। সে রান্নাঘর বরাবর ছুটে মাকে জড়িয়ে ধরে ফোঁপাতে শুরু করে। মা অবুর মনের অবস্থা একটু হলেও বুঝতে পারে। কিন্তু নিজের ভেতরের ঝড়টা কাউকে বোঝাতে পারে না।

অবুর বয়স যখন পাঁচ তখন বাবা ছেলে একসাথে মিলে বাড়ির উঠানে গাছটা লাগায়। বাপ-বেটা দুজনেই সে কী খুশি সেদিন! অবুর বাপ সেদিন বলে, "বুঝলা অবুর মা, আমগোর অবুর লগে পাল্লা দিয়া এই গাছ বড় হইবো। পোলায় আমার গাছপাকা জামরুল খাইবো। তাই না রে বাপ?"
অবু কিছুই না বুঝে ফ্যালফ্যাল করে বাবার দিকে তাকিয়ে ছিলো তখন।

জামরুল গাছটার পাশেই অবুর বাবার কবর। অবুর বয়স যখন আট তখন মা ছেলেকে একলা ফেলে চলে যায় অবুর বাপ। অবু এখন তেরো বছরের কিশোর।

বাপের সাথে অবুর খাতির ছিলো বেশ। একসাথে ভাত খাওয়া, গোসল করা, গাছে পানি দেয়া, মাটিতে ছক কেটে বাঘ ছাগল খেলা আরো কত কিছু! মানুষটা নাই, অবুর সেই খুশিও নাই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবুর মা। তার স্মৃতির স্বামীর চেয়ে বর্তমানের অবুটাই তার কাছে বাঁচার একমাত্র অবলম্বন হয়ে ওঠে। অবুর বাবার রেখে যাওয়া বসতবাড়ি আর সামান্য জমির কারণে মাথার উপর ছাদ আর দুবেলা খাবার জোটে।

এদিকে সকাল থেকেই অবু মনমরা হয়ে ঘুরছে। আজকে যেন রোদের তেজটাও একটু

বেশি। অবুর গায়ের হলুদ শার্টখানা ঘামে ভিজে জবজবে। তবুও অবুর বাড়ি ফিরতে মন চায় না। সে উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে রেললাইনের কাছে চলে আসে। এই লাইনগুলোর উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া অবুর একটা প্রিয় খেলা। তার মন আস্তে আস্তে ভালো হওয়া শুরু করে। মানবজাতি বড়ই অদ্ভুত, কত ক্ষুদ্র ঘটনায় আমরা খুশি হই! আবার কত ক্ষুদ্র ঘটনায় আমরা কী ভীষণ বিষণ্ন হই।

মা হন্যে হয়ে অবুকে খুঁজছে কিছু একটা খাইয়ে দেবে বলে। এই ভরদুপুরের তপ্ত রোদে লোকজন খুব একটা ঘর থেকে বের হয়নি। পথে এক প্রতিবেশী বললো, "অবুরে দ্যাখলাম লাইনের উপরে হাঁটতাসে।" মা দৌড়ে যায় ছেলেটারে ধরে আনতে। আজকে তাকে একটা কড়া ধমক দিতে হবে। মায়া লাগে বলে কখনোই তাকে কিছুই বলা হয় না।

যেতে যেতেই ট্রেনের হুইসেল শুনতে পায় অবুর মা। বুকটা ধক করে ওঠে তার। শরীরের সমস্ত শক্তিটুকু দিয়ে ছুটতে থাকে সে। ছেলেটা যে তার কানে শোনে না, কথাও বলে না। অজানা আশঙ্কায় হাত-পা কাঁপতে শুরু করে অবুর মার।

আশেপাশে ভিড় জমে আছে। সূর্যটা ঠিক মধ্য আসমানে, তবুও চারপাশটা অন্ধকার লাগে অবুর মার। অবু রেল লাইনের ওপর পড়ে আছে– গায়ে তার সূর্যরঙা হলুদ শার্ট। অথচ তার জীবন সূর্য রক্তিম হয়ে ঢলে পড়েছে অকালেই। পড়ে থাকা সূর্যটাকে কড়া ধমক দেয়া হলো না আর। প্রকৃতির নিয়ম অমান্য করে এমন ভরদুপুরে সূর্য অস্ত যায় নাকি? কী আজব!

আমার ইংরাজি গ্রামার বই

কাজী মহিউদ্দিন
প্রাক্তন গ্রুপ সিইও
ব্যাবিলন গ্রুপ

কলিমদাদ খানের ইংরাজি গ্রামার বই ছাড়া চলবে না। সময় বেঁধে দেয়া হলো, ওই দিনের পর থেকে যে ক্লাসে বই নিয়ে আসবে না তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এবং বেত্রাঘাত করা হবে। এভাবেই আমাদের পুরো হাইস্কুল জীবন কেটেছে। হাইস্কুল বললাম এই জন্য যে, আমাদের সময় ক্লাস সিক্স থেকেই ইংরাজি গ্রামার পড়ানো হতো। মাঝেমধ্যে তো হেড স্যার নিজেই টেস্ট ক্লাস নিতে আসতেন। ইয়া লম্বা বেত, অসুরের মতো শক্তি এবং সেই রকম রাগ তার। অনেক পরে বুঝতে পেরেছিলাম, উনারও একটা কমন উদ্দেশ্য ছিলো, সবাই কলিমদাদ খানের ইংরাজি গ্রামার বই কিনেছে কিনা সেটা দেখা। এদিকে আব্বাও ছিলেন নাছোড়বান্দা, কেন বছর বছর নতুন গ্রামার বই কিনতে হবে! আমি আর আমার বড়বোন তিন-সাড়ে তিন বছরের ব্যবধান। আমি যখন ক্লাস সিক্সে, আমার বোন তখন নাইনে। আব্বার এক কথা, সবাই মিলে একটা ভালো গ্রামার বই থাকলেই হলো। গ্রামার কি একেক বই তে একেক রকম হয় নাকি! ফাজলামি! আব্বা ছিলেন ভীষণ বদরাগী, তাই উনার ওপর আমাদের কিছুই বলার নাই। আমাদের একমাত্র লবিং করার জায়গা হলো আম্মা, কিন্তু তিনিও ছিলেন অতিশয় নরম মানুষ। এক ধমকের পর সব শেষ। অতঃপর আমাদের অবস্থা ছিলো ক্ষুদার্ত বাঘের সামনে মুরগি ছুড়ে দেয়ার মতো। এভাবেই হয়তো আজও এমন কঠিন সময় এলে কোনোভাবে আবার বেঁচে ফিরি। শুধু এই গ্রামার বই বিষয়ক জটিলতাই যথেষ্ট ছিলো আমাদের হাইস্কুল জীবনটাকে বিভীষিকাময় করে তোলার জন্য। তবে এটা ছিলো আমার কাছে এক জটিল ধাঁধাঁ, কেনইবা আব্বার জেদ আর কেনইবা স্কুলে বাধ্যবাধকতা। আমার একটু সময়ই লেগেছিলো এই রহস্যভেদ করতে।

আম্মা লবিং করে খুব কদাচিৎই সফল হতেন। তবে এই মহীয়সী মাঝেমধ্যে তার সমস্তটা উজাড় করে আমাদের পাশে থাকার চেষ্টা করতেন। আমি ক্লাসে প্রথম হয়েই ক্লাস সিক্সে উঠেছিলাম, তাই আম্মা একটু আমার প্রতি সদয় ছিলেন। সে তার জমানো কয়েনের বৈয়াম বের করে সব টাকা আমাকে দিয়ে বললেন, যাও বই কিনে নাও। যেন স্বর্গ হাতে পেলাম, তখনও এতোটুকু বোঝার বুদ্ধি হয়ে উঠেনি যে এর পেছনে মায়ের কতো আবেগ ও ত্যাগ জড়িয়ে ছিলো।

টাকা হাতে পেয়েই মাইলের পর মাইল পথ হেঁটে গিয়ে গঞ্জের বাজার থেকে বই কিনে আনলাম, সেই কলিমদাদ খানের গ্রামার বই। তখন আমার এগারো বছর বয়স, সে সময়ে গ্রামে এ বয়সী ছেলেদের অনেক বড় ছেলে হিসেবে দেখা হতো। মা বাবারা এ বয়সের ছেলেদের দিয়ে ঘরে-বাইরে অনেক কাজ করাতেন এবং নিশ্চিন্ত মনে ছেড়েও দিতেন। তখন দূরের গঞ্জের বাজারে যেতে গ্রামের পথের পরেও অনেক খানি হাইওয়ে পার হয়ে যেতে হতো। আজকের দিনের মা বাবারা এটা ভাবতেই পারবে না। ওই বয়সেই আমি হপ্তায় দুবার হাটে গিয়ে বাজার করি। বাবা থাকতেন সিলেটে চাকরির সুবাদে, দু তিন মাস পর একবার আসতেন। আমরা চট্টগ্রামে গ্রামের বাড়িতে মাকে নিয়ে চার ভাইবোনসহ থাকতাম। আমি বড় ছেলে ছিলাম তাই ওই বয়সেই ঘরে-বাইরে সব কাজ আমিই করতাম।

ছোটবেলায় নতুন বই পাওয়ার অনেক উচ্ছ্বাস ছিলো। বারবার এপিঠ ওপিঠ উল্টে দেখা, পাতা নাড়াচাড়া করে সুঘ্রাণ নেয়া। এখনও যেনো সে বয়সে ফিরে গেলাম, সুগন্ধিটা নাকে আসছে। ইংরাজি গ্রামার বই, মাত্র শুরু করবো পড়া, তাই বইয়ের সব লেখা আমার কাছে কতগুলো ইংরাজি বাংলা মেশানো শব্দমালা মাত্র। সহপাঠ গল্প বই হলে পড়াই শুরু করে দিতাম। তাই শুরু হলো বইয়ের যত্ন-আত্তি ভেতরে দ্বিতীয় পাতায় সুন্দর করে নাম, রোল, ক্লাস এসব লিখলাম। আমাদের মামা সম্পর্কের একজন প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমাদের পড়াতেন, উনি আবার আমাদের বই খাতাগুলো সুন্দর করে বাঁধাইও করে দিতেন। পড়াতে এসে নতুন বই দেখলে বলতেন, যাও মার কাছ থেকে সুঁই সুতা নিয়ে আসো আর সাথে পুরোনো ক্যালেন্ডার। তখনও আমরা বাঁধাই করা খাতা পাইনি। দিস্তা করে কাগজ কিনে ঘরে বানাতাম। মামাই আমাদের পড়ানোর ফাঁকে এসব করে দিতেন। এসবে আমরা উনার উপরেই নির্ভর করতাম।

আমার ছিলো ভীষণ জিনিস হারানোর বাতিক, তাই একটু বেশি সতর্ক থাকতাম এবং তারপরও হারাতাম। উল্লেখ্য, আমরা খুব কমই নতুন বই কিনতাম, আমার বড় বোনের বইগুলো আমার জন্য রেখে দেয়া হতো বা চাচাতো ভাই বোনদের পুরাতন বই-ই ছিলো বরাদ্দ, যদি না বুকবোর্ড থেকে কোনো পরিবর্তন আসতো। তো এই ইংরাজি গ্রামার বই-ই আমার একমাত্র নতুন বই, আর যত উচ্ছ্বাস ওটাকে ঘিরেই। কতবার যে প্রতিটা পাতা উল্টে-পাল্টে দেখেছি আর সতর্কভাবে বিশেষ কিছু প্রমাণ চিহ্ন মাথায় নিয়ে নিয়েছি। নাম লিখা থাকার পরও যেন কারও সাথে অদল-বদল হলে চিনে নিতে পারি।

সে কী উত্তেজনা আর স্বস্তি প্রথম যেদিন এই বই নিয়ে স্কুলে যাই। আমাদের সময় শুধুমাত্র কিছু বড়লোকের ছেলেমেয়েরা ব্যাগ বা স্টিলের সুটকেসের মতো বক্স নিয়ে স্কুলে যেত। আমরা তখনও ভাঁজ করা বই বগলে নিয়েই যেতাম। পায়ে হেঁটে অনেকখানি পথ যেতে হতো। পথের মাঝে কতবার ভাঁজ ঠিক করে নিতে হতো। এভাবে অনেকবার বই হারিয়ে কঠিন শাস্তিও পেতে হয়েছে। আর শাস্তি মানেই, আর কথা নাই...। তাই মাঝেমধ্যে বই

ভাঁজ করার পর মাঝ বরাবর রশি দিয়ে বেঁধেও নিতাম। আমি বেশি হারাতাম কলম আর পেন্সিল। কতো যে পিটান খেয়েছি শুধু এই কারণে। হারাতাম স্কুলে আসা যাওয়ার পথে আর টিফিন বিরতিতে। ক্লাসে বই খাতা রেখে খেলতে যেতাম, কিন্তু ব্যাগ ছিলো না বলে কলম পেন্সিল সাথেই রাখতাম আর হারাতাম।

একদিন স্কুল শেষে বাড়ি ফিরে সন্ধ্যায় মামা বলল তোমার নতুন গ্রামার বই বের করো, আজ আমরা গ্রামার দিয়ে শুরু করবো। বই বের করতে গিয়ে দেখি বইয়ের ভাঁজে আমার যক্ষের ধন বইটি নেই। আমি নির্বাক, আমার দুচোখে বন্যা, আমি চিৎকার করে কান্নায় ভেঙে পড়ে বললাম– মামা আমার বই নাই, আমি মনে হয় ওটা হারিয়ে ফেলেছি। মামা আমাকে বকা দিচ্ছেন, আবার কান্না থামানোরও চেষ্টা করছেন। আমার চোখের সামনে যেন এক বিভীষিকা। ক্লাস টিচারকে কী বলব, কী বলব মাকে, বাড়ির কাজ কীভাবে করবো!

সারারাত আমার নির্ঘুম কাটল, কখন স্কুলে যাওয়ার সময় হবে। সকালে একটু আগেই রওনা দিয়েছিলাম, স্কুলে যাওয়ার পথে পুরোটা পথ খুঁজেছি, যদি কোথাও পেয়ে যাই! পুরো ক্লাসরুম তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, প্রত্যেক সহপাঠীকে জিজ্ঞেস করেছি। আমি খুঁজছি আর অঝোরে কাঁদছি। সেদিন ক্লাসেও বীভৎস সময় গেল। বাড়ির কাজ না দেয়া আর বই না থাকা, দুটোর শাস্তি একসাথে পেতে হলো। আমি এমনিতেই ভেঙেচুরে শেষ, তার উপর ক্লাসের শাস্তি। পরের দিনগুলোর কথা ভাবতেই পারছিলাম না।

এভাবে বেশ কিছুদিন বইয়ের শোক বয়ে নিয়েই আমার দিন যায়। বন্ধুরাও সবাই ব্যাপারটা জানে এবং বলাবলি করে। হঠাৎ একদিন এক বন্ধু বলল তোমার বই আমি দেখেছি মনে হয়। ওর বাড়ি একটু দূরে, পাশের গ্রামে। ও বলল, আমি গতকাল সুজনের বাড়ি গিয়েছিলাম, দেখি ওর কাছে একটা গ্রামার বই। আমি সন্দেহ করছি ওটা তোমার। আমি এবার আকাশ পাতাল ভাবনায় পড়ে গেলাম, কীভাবে এই বই উদ্ধার করি। একটা বিষয় খেয়াল করলাম, সুজন গত বেশ কিছুদিন স্কুলে আসছে না। অন্তত আমার বই হারানোর পর ওকে আর স্কুলে দেখিনি। বলে রাখা ভালো, ও ছিলো একটু আধপাগলা টাইপ, কিন্তু মেধাবি; খুব ভালো রাজনৈতিক বক্তাদের নকল করতে পারতো। তাই মঝেমধ্যেই সবাই ওকে চেপে ধরতো বক্তৃতা শোনানোর জন্য, এমনকি আমাদের শিক্ষকরাও। সবাই মজা পেত ওর বক্তৃতা শুনে। যদিও ওর কথাবার্তায় বেশ অপ্রকৃতস্থতা ছিলো সবসময়। ও ছিলো খুবই গরিব ঘরের ছেলে, বাবা নেই, মা-ছেলে শুধুই দুজন। মা গৃহস্থ বাড়িতে কাজ করে সংসার চালায়। পড়াশোনা সে বিনা বেতনেই করে আর পাড়া-প্রতিবেশীর কাছ থেকে বই নিয়ে পড়ে। তার এই অবস্থা আমরা ছাত্র-শিক্ষক সবাই জানি। তাই তাকে বই না থাকার জন্য কখনোই ক্লাসে শাস্তিও পেতে হয় না। তাই আমার বন্ধুরা ও আমি, সবাই ধরে নিয়েছি বই সুজনের কাছেই আছে।

আমি ছোটবেলা থেকেই একটু ভীতু, অ্যাডভেঞ্চার করা আমার সাথে যায় না। তারপরও এই বইয়ের জন্য কোথা থেকে যেন সাহস চলে এল। সিদ্ধান্ত নিলাম, এই অভিযানে আমি যাবই। এই পর্যন্ত সুজন আর স্কুলে আসেওনি। সুজনের পাশের বাড়ির বন্ধুটিকে রাজি করালাম, যে আমাকে বইয়ের খোঁজ দিয়েছে। বন্ধু, 'তুমি আমাকে ওর বাড়ি নিয়ে চলো।'

সেদিন ছিলো ছুটির দিন। আমি রওনা দিলাম পাশের গ্রামে, বন্ধুর বাড়ি। দুরু দুরু বুক, শরীরময় কেমন যেন একটা অনুভূতি। বন্ধু আমাকে সুজনের বাড়ির উঠানে রেখে চলে গেল, বাকি কাজ আমাকেই করতে হবে, একা। মজার ব্যাপার, সুজন আমাকে দেখে মোটেই চমকাল না। ওর মা বাড়ি নেই, গৃহস্থ বাড়ি গেছে প্রতিদিনের মতো। আমি তাকে বললাম, তোমার ইংরাজি গ্রামার বইটা দেখাও, আমি একটু পড়া তুলব। সে কোনো দ্বিধা না করেই বইটা আমাকে বের করে দিলো। মামা আমাকে বইটাতে সাদা ক্যালেন্ডার এর মলাট করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন বইটা খাকি কাগজের মলাটের। মলাট উলটাতেই দেখি দ্বিতীয় পাতাটা ছিঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। আমার আর বুঝতে বাকি রইল না। দ্বিতীয় পাতাতেই আমার নাম, রোল, ক্লাস এসব লিখা ছিলো। তারপর ও সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য আমি আমার প্রমাণ চিহ্নগুলো খুঁজতে লাগলাম। একে একে সব মিলে গেল, এবার আমার সত্যিকারের সাহস প্রমাণের পালা। সুজনকে বললাম, আমার জন্য এক গ্লাস পানি আনতে। এগার বছর বয়সে আমার এর চেয়ে বেশি ভালোমন্দ বোঝার বুদ্ধি হয়নি তখন। আমি বই আর প্রাণ দুটো নিয়ে চিতার বেগে দৌড় দিলাম। সুজন বুঝতে পেরে চিৎকার শুরু করে দিলে পাড়ার মানুষ আমার পিছু নিয়েছিলো। আমার পায়ে ছিলো দুই ফিতার স্পঞ্জের চপ্পল, সেদিন অতিরিক্ত গতি পেতে আর বই উদ্ধার করতে ওই চপ্পল জোড়া আমি বিসর্জন দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি সফল হয়েছিলাম, বিদ্যুৎ গতিতে বড় রাস্তা পেরিয়ে বাজারে চলে আসি। আমি একবারের জন্যও পেছন ফিরে তাকাইনি। সেদিন আমি এক নিঃশ্বাসে কয়েক মাইল পথ পাড়ি দিয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম বিজয়ীর বেশে। আমি আমার বইটা ফিরে পেয়েছিলাম ওটুকুই ছিলো সেদিন আমার ভাবনা ও বিবেচনা।

ঠিক পরের দিন সুজন স্কুলে এল আর আমার কাছ থেকে বইটা দাবি করল। বাকি বন্ধুরা ছিলো আমার পাশে। তারপরও ক্লাস টিচার এলে সুজন তার অভিযোগ জানালো। স্যার দুজনের কাছ থেকেই প্রমাণ চিহ্ন জানতে চাইলে, সুজন কিছুই বলতে পারল না, আর আমার সব মিলে গেলো। এটাও দেখলো যে, দ্বিতীয় পাতা ছেঁড়া। সেদিন সুজনকে স্যার শাস্তিও দিয়েছিলেন এমন অনৈতিক কাজ করার জন্য। কিন্তু, আজও আমার সুজনের জন্য খারাপ লাগে। আমাদের মধ্যে এমনটা না হলেই ভালো হতো। আমি জানি না এখন সুজন কোথায় আছে, কেমন আছে। আমার অনেক বন্ধুর মতো আমি ওকেও হারিয়ে ফেলেছি। জানি না আমাদের মধ্যে কার কী ভুল ছিলো!

মৃত্যু উপত্যকার কাব্য

এস এম আরিফ রাজ্জাক
সিওও
ব্যাবিলন ট্রিমস লিমিটেড

১.

আফগানিস্তান। সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর। প্লানেট আর্থের মৃত্যু উপত্যকা। আমরা কি জানি এই ভয়াল উপত্যকার মৃত্যুর শেষ চিৎকার ছাপিয়ে কবিতার পঙ্‌ক্তি পরিশুদ্ধ করে শব্দের মৃত্যু দূষণ! কবিতা যেন এই উপত্যকার নারীদের আত্মকথা, তাদের অলীক চাওয়ার কাব্যিক প্রকাশ। এই কাব্যকে ধারণ করতে যেয়ে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে হয়েছে কিন্তু নির্ভিক আফগান নারী কবিরা কিছুতেই পিছুপা হননি।

প্রাচীনকাল থেকেই এই দেশে নারীদের কবিতা লেখাটাকে ভয়াবহ অপরাধ ও পাপ হিসাবে গণ্য করা হয়। কবিতা বা সঙ্গীতের সাথে কোনো নারীর সংশ্লিষ্টতা ধরা পড়লে তাদের মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেয়ার বিধান আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নারীদের কলম কিন্তু থেমে থাকেনি। চরম প্রতিকূল অবস্থায়ও কিছু সাহসী আফগান নারী কলম ধরেছেন অতি গোপনে। রেখে গেছেন তাদের কাব্য প্রতিভা।

আফগান নারী কবিদের কথা বললে প্রথমে যার নাম উচ্চারণ করতে হয় তিনি হলেন রাবেয়া বালখি। রাবেয়া ছিলেন বালখের প্রতাপশালী শাসকের কন্যা। তিনি তার কবিতা প্রেমিকপুরুষ– বাবার সেনাপতি বক্তাসের উদ্দেশেই মূলত লিখেছেন। রাবেয়ার ভাই হারিস তার বোনের কবিতা দেখে ধরে ফেলেন সেনাপতির প্রতি তার প্রেমের কথা। রাবেয়া যে হাত দিয়ে কবিতা লিখতেন সেই হাতকে কেটে ফেলা হয় এবং রক্তক্ষরণে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। বিশ্বের ইতিহাসে কবিতা লেখার জন্য হাত কেটে কবিকে মেরে ফেলার করুণ দৃষ্টান্ত মনে হয় এটাই প্রথম।

যখন রাবেয়ার ডানহাত কেটে ফেলা হয়েছিলো তিনি বাম হাত দিয়ে জীবনের শেষ কবিতার একটা পঙ্‌ক্তি দেয়ালে তার রক্ত দিয়ে লিখে যান যার বাংলা করলে দাঁড়ায়–
“যদি ভালোবাসো প্রাণের শেষ স্পন্দনে
পান কর অসীম জীবনের অমৃত
পান কর কষ্টজারিত সুরা আনন্দে

বিষকে পান কর মধু ভেবে”

একটা কথা এই সময়ের ইন্টেলেকচুয়াল জগতে বেশ প্রচলিত তা হলো ‘রেকারেন্স অব থট, রেকারেন্স অব টাইম।’ আফগানিস্তানে ‘রেকারেন্স অব টাইম’ এর ঘটনা যেন ঘটেছে। ২০০৫ সালে আর এক কবি নাদিয়া আঞ্জুমানকে হত্যা করা হয় শুধু কবিতা লেখার জন্য। নাদিয়ার স্বামী এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডটি ঘটায়। নাদিয়া প্রাণ দিয়েছেন তার পূর্বসুরী রাবেয়ার মতো কিন্তু আপোষ করেননি। তিনি কবিতার জগৎ থেকে নির্বাসন নেননি। জীবনকে উৎসর্গ করে কাবিতাকে সাথে নিয়ে নাদিয়া অনন্তলোকে যাত্রা করেন। জীবনের ঊর্ধ্বে এই কবি কবিতাকে স্থান দিয়েছিলেন।

আফগানিস্তানে এমন অনেক নারী কবি আছেন যারা জর্জ এলিয়টের মতো নিজের পরিচয় গোপন রেখে আমৃত্যু লিখে চলেছেন পুরুষদের ছদ্মনামে। সাহিত্যের ইতিহাসে হয়তো তারা স্ব-পরিচয়ে আর হয়তো পরিচিত হতে পারবেন না কারণ এমন ছদ্মনামে লিখে লিখে তাদের অনেকেই এ জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন। নারী কবিরা এমনভাবে পুরুষ পরিচয়ে অতি গোপনে কবিতা লিখে গেছেন কবিতাকে জীবনের চেয়েও ভালোবেসে। একটা আশ্চর্য বৈপরীত্য আফগান সমাজে। যে সমাজ চরমতম মৌলবাদ, যে সমাজ সন্ত্রাসে ভরপুর, যে সমাজে মানবাধিকারের লেশমাত্রও নেই সেই সমাজের সাহসী নারীরা জীবনের মায়া ত্যাগ করে কবিতার মাঝে মনের সৌন্দর্যের চর্চা করে গেছেন।

২.

শিক্ষিত আফগান নারী কবিরাও কম যান না। তাদের কবিতাও দারুণভাবে সেন্সুয়াল। বাহার সাইদ পশ্চিমে বাসরত এমনই একজন নারী আফগান কবি। সাইদ তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ইরান’ এর প্রকাশ করেন ইরানের বিপ্লবের আগে। তিনি আফগানিস্তান ত্যাগ করেন দেশটিতে সোভিয়েত আগ্রাসনের আগেই। তার অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু হলো প্রেম আর দেশটির কট্টর ধর্মীয় অনুশাসন এবং নারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে। তার দেখা আফগানিস্তানে নারীদের পণ্যের মতো ব্যবহার করা হতো যেখানে পারিবারিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সবকিছুর নিয়ন্ত্রক হলো পুরুষ এবং তাদের ধর্মীয় নিয়মনীতি, যার অনেক কিছুই তাদের মতো করে পরিবর্তন করে নেয়া। সাইদ তার কবিতায় এই বৈষম্য এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি তার প্রেমিকের সাথে সম্পর্ককে কবিতায় এমন শারীরিক ইমেজে উপস্থাপন করেন–

“তার ঠোঁটের অঝোর বর্ষায় ডুবে যায় আমার ঠোঁট
কে তুমি আমাকে হরণ করো আমার তন্দ্রার মাঝে?
কেঁপে উঠি আমি তোমারই ছোঁয়ায়।
এসেছি তোমার কাছে তোমাতে হারিয়ে যেতে

ঠোঁটের সাথে ঠোঁটের মিলনে এক হয়ে যাই তুমি আমি
আমার নখগুলো কাঁচি হয়ে কেটে ফেলে তোমার জামা
তোমার খোলা বুকের জমিনে আমার ভালোবাসার বাসা
তোমার শ্বাস যেন মদিরা গন্ধে আমাকে মাতাল করে
আমার স্তনের আদরে জেগে ওঠো তুমি সোনালি আগুনে
পোড়াও আমাকে পোড়াও, আমি যে তোমারি, তোমারি!"

একটা বিষয় লক্ষণীয় সেটা হলো আফগান নারী কবিদের কবিতার বিষয়বস্তু। তাদের কবিতার বিষয়বস্তু হলো প্রেম। আর বর্বর পুরুষ শাসিত সেই সমাজের নারীরা খুঁজে ফিরছেন রোম্যান্টিক প্রেমিক পুরুষকে। তারা তাদের কবিতার মাঝে জানান দিচ্ছেন যে তাদের মন ও শরীর প্রেমিক পুরুষদের জন্য আকুল হয়ে অপেক্ষা করছে। আর প্রেমের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে তারাই মানে নারীরাই চালকের স্থানে থাকতে চান। পুরুষদের এত অত্যাচার সত্ত্বেও তারা তাদের কল্পনায় আমাজন ওয়ারিয়রের জগৎ সৃষ্টি করেন না বরং তারা রচনা করেন প্রেমিক পুরুষদের সাথে তাদের প্রেমময় জগৎ, কল্পনা করছেন সেই সব পুরুষদের যারা তাদের প্রেমকে গ্রহণ করবে আর অকাতরে প্রেম দেবে।

৩.

সিলভিয়া প্লাথের পরে আর একজন নারী কবি নিজেকে পুড়িয়ে মারেন। তিনি হলেন আফগান কবি রাহিলা মুশকা। আফগানিস্তানের প্রত্যন্ত পর্বত এলাকা হেলমানের মুশকার কখনোই পরিচয় ছিলো না আমেরিকান কবি প্লাথের সাথে। তার কখনোই সুযোগ হয়নি প্লাথকে পড়ার। অথচ কী ট্রাজিক মিল এই দুই কবির। তাদের মিল মৃত্যুর প্যাটার্নে। ভিন্নতা মৃত্যুর কারণে। প্লাথ সৃষ্টিশীলতার স্কিতযোফ্রেনিক তাড়নায় নিজেকে পোড়ান। রাহিলা মুশকা কবিতাকে ভালোবেসে, কবিতা বিরোধীদের সাথে আপোষ না করার জন্য নিজেকে পুড়িয়ে মারেন। মুশকার আত্মাহুতি ছিলো কবিতাকে ভালোবেসে কবিতা বিরোধীদের প্রতি প্রতিবাদ।

অন্যান্য আফগান মেয়েদের মতো মুশকাও ছিলেন গৃহবন্দি। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ হয়েছিলো তার। তালেবান অধিকৃত হেলমানে মুশকাকে তার বাবা কামুক ওয়ারলর্ডদের চোখে যেন না পড়ে তার জন্য কড়া নজরদারিতে রাখেন। মুশকার ছিলো অনুভূতিশীল মন আর ছিলো প্রখর কল্পনাশক্তি। আর তাই তিনি তার অনুভূতিগুলোকে কবিতার মাঝে প্রকাশ করতে থাকেন।

একদিন সে ফোনে তার লেখা কবিতা পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন আর এক কবি বান্ধবিকে আর তখনি ধরা পড়ে যান তার বোনের স্বামীর কাছে। নরক নেমে আসে তার উপর। নির্মমভাবে তাকে মারধোর করা হয়। তার কবিতার খাতা পুড়িয়ে ফেলা হয়। মূমুর্ষু অবস্থায় তাকে

হাসপাতালে নেয়া হয়। তিনি বুঝতে পারেন তার আর কবিতা লেখা হবে না। সেই হতাশা থেকে তিনি হাসপাতালেই নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে নিজেকে পুড়িয়ে মারেন। রাহিলা মুশকা চলে যান কবিতাকে সাথে নিয়েই। কবিতা ছাড়া তিনি নিজেকে হয়তো ভাবতে পারছিলেন না এই নশ্বর জগতে।

মুশকা প্রশ্ন করেছিলেন তার সমাজের কাছে এই বলে যে– 'যদি ইসলামের আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে ভালোবাসতে পারেন তবে তিনি কেন কবিতাকে ভালোবাসতে পারবেন না?' যদিও এই প্রশ্নের উত্তর তাকে দেয়া হয়নি।
টিনেজ এই কবি ২০১০ সালে তার জীবনাবসান ঘটান।

তার লেখা ল্যান্ডাই যা তার বন্ধু নারী কবিদের কাছ থেকে সংগৃহীত।

"আমার শরীর সবুজ হেনা পাতার মতো সজীব
ভেতরটা রক্ত মাংসে গড়া মানুষ"

তার লেখা আর একটি ল্যান্ডাই-
"ভাগ্যাহত তুমি আসলে না কাল রাতে
তোমারই প্রতীক্ষায়-
খাটের কাঠ-পাটাতন সরিয়ে
আমার নরম শরীরই ছিলো
কাল রাতের শয্যা"

তথ্য সূত্র–
1. Songs of Love and War: Afghan Women's Poetry by Baha Al-Din Majruh, Bahā' al-Dīn Majrūḥ, Sayd Bahodine Majrouh, Translated by Marjolijn De Jager, André Velter
2. Afganistan on Love and Suicide – Pullitzer Report
3. Afganistan Has Poetry in its Soul by Reza Mohammad, Published in The Guardian on May 21, 2012
4. Faithful infidel by Bahar Sayed

কিডনি সমস্যা এক নিঃশব্দ ঘাতক

ডা. আতিকাহ্ ইসলাম চৌধুরী
মেডিকেল অফিসার
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

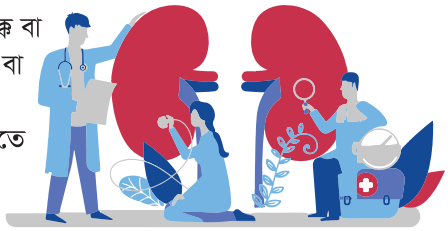

আমাদের শরীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল বৃক্ক বা কিডনি। কোনও কারণে কিডনি আক্রান্ত হলে বা কিডনিতে কোনও রকম সংক্রমণ হলে শরীরে একের পর এক নানা জটিল সমস্যা বাসা বাঁধতে শুরু করে। তাই কিডনির সমস্যাকে "নিঃশব্দ ঘাতক" বলেই ব্যাখ্যা করে থাকেন অনেক চিকিৎসক। কারণ কিডনির সমস্যা বা অসুখের কোন নির্দিষ্ট উপসর্গ হয় না। তবে কয়েকটি উপসর্গ যা দেখলে অত্যন্ত সাধারণ বলে মনে হলেও এগুলো লক্ষ করলে আগে থেকেই সতর্ক হওয়া যায়। আসুন জেনে নেয়া যাক তেমনি কয়েকটি উপসর্গ সম্পর্কে, যেগুলো কিডনি সমস্যার আগাম ইঙ্গিত হতে পারে।

১। মুখ, চোখের কোণ যদি হঠাৎ অস্বাভাবিক ভাবে ফুলে ওঠে, তা হলে অবশ্যই সতর্ক হওয়া জরুরি।

২। বার বার প্রসাবের বেগ অনুভব করলে সে ক্ষেত্রে আগে থেকেই সাবধান হওয়া প্রয়োজন। কিডনি সঠিকভাবে কাজ না করলে এই সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৩। যদি দেখেন আপনার হাত, পা বা পিঠের পেশীতে ঘন ঘন অস্বাভাবিক টান বা খিঁচুনি ধরছে, তাহলে অবশ্যই সতর্ক হওয়া জরুরি।

৪। আপনার ত্বক কি অসময়ে হঠাৎ শুষ্ক হয়ে গিয়েছে, তাহলে অবশ্যই সতর্ক হওয়া জরুরি। কিডনি সমস্যায় এমনটা হতে পারে। কারণ কিডনি আমাদের ত্বককে শুষ্ক ও রুক্ষ করে দেয়।

৫। যদি দেখেন পায়ের গোড়ালি বা পায়ের পাতা হঠাৎই অস্বাভাবিক ফুলে যাচ্ছে, তাহলে অবশ্যই সতর্ক হওয়া জরুরি।

৬। কিডনি সমস্যা থাকলে একাধিকবার মূত্রথলিতে সংক্রমণ হতে পারে। এছাড়াও প্রস্রাবের সময় জ্বালাপোড়া বা ব্যথাও হতে পারে।

৭। পিঠের দিকে, কোমরের একটু উপরে যদি ঘন ঘন ব্যথা অনুভব করেন তাহলে সতর্ক হওয়া জরুরি।

৮। কিডনি সমস্যায় ঘুমেরও ব্যাঘাত ঘটতে পারে। কিডনি ঠিকমতো কাজ না করলে রক্ত ঠিকমত পরিশুদ্ধ হতে পারে না।

৯। রক্তচাপের দ্রুত উঠানামা, অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়া, অল্পতেই হাঁপিয়ে ওঠা, শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হওয়ার পেছনেও লুকিয়ে থাকতে পারে কিডনির সমস্যা।

১০। যদি দেখেন প্রস্রাবের সাথে রক্ত যাচ্ছে, তাহলে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

উল্লেখিত উপসর্গগুলো লক্ষ করলে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো অবশ্যই মূত্র (ইউরিন) পরীক্ষা করিয়ে নেয়া প্রয়োজন। কোন ত্রুটি থাকলে অবশ্যই নেফ্রোলজিস্ট বা কিডনির রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ যত দ্রুত সম্ভব নেয়া জরুরি।

নিয়তির খেলা

বিউটি খাতুন
মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট
ব্যাবিলন প্রিন্টার্স লিমিটেড

'হাবলু, এই ল ভাই খাওনের বাডিডা ধর, সবকিছু গোছান হইয়া গেছে চল যাই।'

আমি ফাতেমা। মা বাবা দুজনেই মইরা গেছে। আমি মানুষের বাড়িত কাম কইরা খাই। আমার ছোট একটা ভাই হাবলু, আমরা দুই জন মিলাই আমাগো সংসার। হাবলুই আমার সব। ওর বয়স পাঁচ বছর। তাই আমি যেইহানে যাই সব সময় ওরে লগে নিয়া যাই। এহন যাইতাছি সেই বাসায়, যেই বাসায় কাম করি হেই বাসায়। সকাল থেইকা বিকাল পর্যন্ত আমার ডিউটি। আমি মেলা দিন ধইরা ওই বাসায় কাম করি।

'ও মামা, যাবেন? ওই চার রাস্তার মোড়ে?'
– আহেন।
– ওঠ হাবলু।

তারপর মোড়ে নামলাম একটুখানি হাডতেই আইজও পাগলডারে দেখলাম। আর পাগলডা খালি হাবলুর দিগে চাইয়া থাহে। কিছুই না কইয়া হাবলুরে নিয়া হাইডা যেই বাসায় কাজ করমু হেই বাসায় আইলাম। পাগলডারে পেরায়ই দেহি ওইহানে বইয়া থাকে। মাঝে মাঝে ডর করে। আইচ্ছা ওই সব বাদ দিয়া কামকাইজ করি এহন। আমি তো কাম করতে আহি, আর হাবলুরে কই কোনহানে না যাইতে। কিন্তু ও মাঝে মাঝেই আমার চোখ ফাঁকি দিয়া বাইরে বাইর হইয়া যায়। আবার ডিউটি শেষ হওয়ার আগেই চইলা আহে। কিছু জিগাইলে কয় খেলছি বাহিরে। আমি কাম কাজ কইরা বাসায় চইলা যাই। যাওয়া-আসার সময় প্রতিদিন দেহি ওই পাগলডারে। সারাদিন খাওয়া নাই, গোসল নাই, ছিরা একটা গেঞ্জি-লুঙ্গি, মাথা ভর্তি চুল, দেখলেই মায়া লাগে। আমরাও তো গরিব, তাই গরিবের কি কষ্ট আমি তা বুঝি। আর যাওয়া আসার সময় খালি হাবলুর দিকে তাকায় থাহে। মনে হয় যেন হাবলুর মাঝে সে কাউরে খুঁজতাছে। মাঝে মাঝে ওনার কথা ভাবি কিন্তু কথা কইতে সাহস পাই না। আইজগা কাম শেষ কইরা বাসায় যাওনের সময় খালাম্মা আমারে কইলো আইজ তর বাসায় যাইয়া রান্ধা লাগবো না। এহান থেইকা খাবার লইয়া যা। আমিও একটু খুশি হইলাম। খালাম্মার কথা মতো খাওনডা লইয়া হাবলুর সাথে হাঁটতে হাঁটতে যাওয়ার সময় সামনেই পাগলডারে দেখলাম, কি যেন একটা কামড়াইতাছে। মনে হয় খিদা লাগছে। আমি দাঁড়াইলাম আর হাবলু আমারে কইলো– বুবু, চল আইজগা ওই পাগল চাচারে কয়ডা খাওন দিয়া যাই। হে আমারে মেলা আদর করে। আমি মাঝে মাঝে তার কাছে আহি।

আমি কিছু না কইয়া তার কাছে গেলাম, গিয়া কইলাম, ভয়ে ভয়ে জিগাইলাম চাচা ভাত খাইবেন? হে আমারে কইলো থাকলে কয়ডা দেও। মেলা খিদা লাগছে। আমিতো অবাক হইয়া গেলাম, সে আমার সাথে কথা কইলো, সে তো পাগল না। মানুষজন তারে নামের পাগল বানায় রাখছে। তারপর তারে খাইতে দিলাম। একটু খাইয়া কয়, 'আমি আর খামু নারে মা।'

– কেন চাচা কী হইছে?

তার চোখ দিয়া টপটপ কইরা পানি পরতাছিল। আর হাবলুর দিকে বার বার তাকাইতাছিলো। আমি বললাম, 'চাচা আপনার কি হইছে, কানতাছেন ক্যান? আপনার কি কেউ নাই?'

– তুই এত কিছু বুঝবিনারে মা। তুইতো ছোট মানুষ এত কিছু বুঝবি না।

চাচার কষ্ট দেইখা আমার খারাপ লাগতাছিলো তাই কইলাম, 'চাচা কি হইছে আপনার? আমারে কন' তারপর সে আমারে কইতে থাকলো–

'ছোটবেলা থেইকাই অনেক কষ্ট করে বড় হইছি, গরিব ছিলাম বইলা পড়াশোনাও করা হয় নাই। কোনোরকম ফাইভ পর্যন্ত পড়ছিলাম। বিয়ের পরও আমার সংসারের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। তারপর আমার ছেলেটা হওয়ার পর বউ আর ছেলেটাকে নিয়ে একটু ভালো থাকার জন্য নিজের চকের জমিজমা সব বিক্রি কইরা মানুষের কাছ থেকে ধারদেনা করে সুদের উপর টাকা নিয়ে বিদেশ যাওয়ার জন্য টাকা জমা দিছিলাম। দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস, দেখতে দেখতে প্রায় ৮-৯ মাস হইয়া গেল, আমার যাওয়ার কোন খবর হয় না। নিদ্রাহীন রাতের ক্লান্তি সব সময় আমার দেহ মন জুড়ে, রাত হলে মনে হত কখন দিন হবে, আর দিন হলে কখন রাত হবে তাই মনে হতো। সংসার চালাতেও কষ্ট হচ্ছিল, বাচ্চাটারেও ঠিকমতো খাবার জোগাতে পারছিলাম না। দেখতে দেখতে তিথি (বউ) একদিন বললো কি গো, তোমার এখনো তো কোন খবর হচ্ছে না, এদিকে লোকজন তো তাদের পাওনা টাকা চাইতে শুরু করেছে। সবাই কানাঘুষা শুরু করেছে যে মতি মিয়া আর মনে হয় যেতে পারবে না। এসব শুনে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। তারপর আমি তার সাথে অর্থাৎ যাকে টাকা দিছি তার সাথে যোগাযোগ করি। সে শুধু ডেট দেয় আর ঘুরায়, প্রতিনিয়ত মিথ্যা বলে, বলে আগামী মাসেই আপনার ভিসা চলে আসবে। কিন্তু সবই ছিল তার মিথ্যা কথা। আমি কিছু দিন থেকেই বুঝতেছিলাম আমার হয়তো আর বিদেশ যাওয়া হবে না। বুঝার পরে আমি তাকে অনেক কাকুতি মিনতি করে বলেছিলাম যে আমি গরিব, অসহায় একটা মানুষ আপনি যদি না পারেন তবে আমার টাকাগুলো ফেরত দেন। না, সে যেন আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল। কিছুতেই কিছু হলো না। তারপর একদিন গ্রামের মেম্বার আর মুরুব্বিদের ডেকে সব কিছু বললাম। তারা বললো আমরা দেখবো মতি মিয়া তোমার বিষয়টা। দেখব বলা পর্যন্তই যেন শেষ। আসলে যার মাথা তার ব্যথা। তারপর তারা কেউই কিছুই করলো না আমার জন্য। আমার একটি টাকাও আমি ফেরত পেলাম না। বিদেশের কথাতো বাদই রইল। আমার মতো একটি গরিব অসহায়ের টাকা মেরে দিলো, বেইমানি করল আমার সাথে। এদিকে আমার বউ বাচ্চার দিকে তাকানো যায় না, ওদের কষ্ট যে আমার আর সহ্য হয় না। একদিন রাতে হঠাৎ করেই দেখি আমার বাবুর খুব জ্বর

উঠেছে, সাথে শ্বাসকষ্ট, ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। তিথি আমাকে বললো– কিছু একটা করো, ওকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে। আমার কাছেওতো কোন টাকা নেই। আমি যে কি করবো নিজেই বুঝতেছিলাম না। তবুও আর দেরি না করে বেরিয়ে পরলাম। এক ভাইয়ের কাছে কিছু টাকা ধার চাইলাম, তার বউ আমাকে বললো– এমনিতেই তো দুনিয়াটা সহ ঋণ দেনা করে ভরাইছো, এখন আবার টাকা চাইতে এসেছো? যাও, কোন টাকা হবে না। আরো দুই/তিন জনের কাছে গেলাম তাদেরও একই কথা। শেষমেশ এক ধনী ব্যক্তির কাছে গেলাম সে আমাকে বললো টাকা দিতে পারি তবে তোমার যে থাকার ঘর ও ভিটেটা আছে সেটা যদি আমাকে লিখে দাও তবেই টাকাটা পাবে। কারণ টাকা নিলে তুমি ফেরত দিতে পারবে কিনা তার ঠিক নেই।

সেটা তো সন্দেহ। আর কিছু না ভেবে তার কথা মেনে নিলাম। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল। ওদিকে বাবুর অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। সবকিছুর ব্যবস্থা করে টাকাগুলো নিয়ে বাবুকে নিয়ে হাসপাতালে রওনা দিলাম। বাবু ওর মায়ের কোলে, প্রচণ্ড জ্বরে শরীর গরম হয়ে আগুন বরাবর, ওর খুব কষ্ট হচ্ছে, এরই মধ্যে বাবু কেমন যেন শান্ত হয়ে গেলো। ওর আর কোন কষ্ট হচ্ছে না, চুপ করে মনে হয় ঘুমিয়ে পরেছে, এতক্ষণে আর বুঝতে বাকী রইলনা যে বাবু আর নেই। তারপর বাবুকে নিয়ে আসলাম বাড়িতে, নিয়ে এসে ওর দাফন কার্য সম্পন্ন করলাম। এর ত্রিশ দিন পরই ঐ ধনী ব্যক্তি, আরো যারা আমার কাছে টাকা পাবে তারা সবাই আমার কাছে টাকা চাইতে বাড়িতে এলো। আমি বললাম আপনারা আমাকে একটু সময় দিন, আমি আপনাদের টাকা পরিশোধ করে দিব। যদি বেঁচে থাকি। নাহ আমার কথায় কেউ ক্ষান্ত হলো আবার কেউ হলো না। তারা আমাকে একটু দয়া করলো। তারা সময় দিল। তারপর আমি আর আমার তিথি দুজনে মিলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম যা কিছু ছিল তাই নিয়ে। কারণ ঐ বাড়িটাও তো আর আমার নয়। কোথায় যাবো কি করবো, কিছুই জানি না। আমার বউ বললো, মানুষের ঋণ তো শোধ করতেই হবে, এখানে থেকে আর কি হবে। তারপর দুজনে বুদ্ধি করে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিলাম। চিনি না, জানি না, কার কাছে যাবো, কই যাবো। তারপর ঢাকায় পৌঁছলাম। ছোট্ট একটা বাসা ভাড়া নিলাম দুই-চার দিন এমনিতেই কেটে গেল। খাওয়া দাওয়ার কোন ঠিক নেই। পরে একটা কাজ পেলাম। এক ভদ্রলোক আমাকে কাজটা দিলো, কাজটা যদিও অনেক কষ্টের ছিলো, তবে টাকাও ছিল বেশ। কিছুদিন করার পর থেকে আমার তিথিও যাইতো ঐ অফিসে। আমরা দুজন মিলে কাজ করে টাকাগুলি বাড়িতে পাঠিয়ে দেই। মানুষের ধারের টাকা শোধ করতে থাকি। দেখতে দেখতে অনেক বছর হয়ে গেছে ঢাকায় এসেছি। কাজের চিন্তায় খাওয়াদাওয়াটাও ঠিক মতো করা হয়নি। সব কিছু বাদ দিয়ে যেন কাজের পেছনেই ছুটেছি। মানুষের ঋণ যে পরিশোধ করতে হবে। আমার তিথিও নিজের শরীরের যত্নটাও ঠিক মতো নেয়নি। এভাবে করে আমরা দুইজন মিলে মানুষের সব ঋণ পরিশোধ করে দেই। তারপর একদিন তিথি বললো অনেক বছর তো হয়ে গেলো ঢাকায় এসেছি। ধারদেনা তো পরিশোধই হয়ে গেছে, চল আমরা গ্রামে চলে যাই। এখন আর কাজ করতে ভালোও লাগে না। বয়সও তো কম হলো না। গ্রামে গিয়ে কোন রকম একটা

মাথাগুজার ঠাঁই করে দুবেলা দু'মুঠো ডাল ভাত খেয়ে বাকি জীবনটা পার করে দেব। আল্লাহ যেন আমাদের সহায় হোন। আমিও আর ওর কথার অমত করলাম না। তার দুই দিন পরই সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম। বাসে উঠলাম। বাসে বসে তিথি আর আমি অনেক গল্প করছিলাম। আজ কতদিন পর বাড়ি যাচ্ছি, বাড়ির লোকজন হয়তো আমাদের চিনতেই পারবেনা, তিথি এসব বলছিলো। আরো বলল আমরা কিন্তু প্রথমেই আমাদের বাবুর কবরের কাছে যাবো। আমি বললাম ঠিক আছে। আর গাড়ি তার আপন গতিতেই চলছিলো। হঠাৎ করেই কিছুদূর যাওয়ার পরই গাড়িটি দুর্ঘটনার শিকার হয়। অনেক মানুষই মারা যায়, এমনকি আমার তিথিও। সবই নিয়তির খেলা। আল্লাহ যে কেন আমাকে বাঁচিয়ে রাখলেন তা আল্লাহই ভালো জানেন। সবাইকে তো একদিন তার কাছে যেতেই হবে। আমিও এখন সেই অপেক্ষাতেই আছি। আর আমার ছেলেটাও ছিল এই হাবলুর মতো। তাই ওর দিকে সবসময় তাকিয়ে থাকি। আজও আমার তিথি ও বাবুর কথা ভুলতে পারি না।"

হঠাৎ করেই মাগরিবের আজান কানে ভেসে আসলো। চাচার কথা শুনতে শুনতে কখন যে সন্ধ্যা হয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। তারপর চাচার সব কথা শুনে বললাম চাচা আপনি আমাদের সাথে চলেন। আমাদের সাথেই থাকবেন। তারপর চাচা বললো, 'না রে মা, আমার যে আর ঘরে ফেরা হবে না। তোমরা চলে যাও। তোমাদের জন্য আমার দোয়া রইলো।'
বলতে বলতে চাচা আপন মনে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। তারপর থেকে আর কোন দিন চাচার দেখা পাইনি।

"জীবনের রং বড়ই বিচিত্র
কখনো লাল কখনো সবুজ
কখনো উড়ে চলা মুক্ত বিহঙ্গের মতো
আবার কখনো ঝরে যাওয়া ফুলের মতো।"

স্বপ্ন প্রদীপ

সাদিয়া আলম
সিনিয়র কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

তখন ২০১৭ সাল। হঠাৎ একদিন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নূর ইসলাম স্যার এসে বললেন, সাদিয়া আপনাকে এমদাদ স্যার ডেকেছেন। আকস্মিকভাবে প্রচণ্ড ভয় ও পাশাপাশি আনন্দও কাজ করেছে। ভয় পাওয়ার কারণ হচ্ছে শ্রদ্ধেয় এমদাদুল ইসলাম স্যার আমাকে যা জিজ্ঞাসা করবেন তার সঠিক উত্তর দিতে পারবো তো! আল্লাহর কাছে মনে মনে প্রার্থনা করলাম যেন স্যার আমাকে যা প্রশ্ন করেন তার সঠিক উত্তর দিতে পারি। তারপর মাননীয় পরিচালক স্যারের রুমের সামনে পৌঁছে দিয়ে আসলেন নূর ইসলাম স্যার। এবার শ্রদ্ধেয় স্যারের রুমে প্রবেশ; তিনি আমাকে দেখেই এত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় কথা বললেন! আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম এবং মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথাগুলো শুনছিলাম। কী সুন্দর করে মৃদু হাসি দিয়ে কথা বলেন। শ্রদ্ধেয় স্যারের সাথে সেদিনই এতক্ষণ কথা বলার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছিলো।

ওনার সাথে কথা বলে জানতে পেরেছিলাম, ছোটবেলা থেকে জ্ঞান আহরণের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা ছিলো তাঁর। তিনি বই পড়তে ভালোবাসেন এবং তিনি আরো বললেন যতদিন দৃষ্টিশক্তি ভালো থাকবে ততদিন বই পড়বেন। বেশকিছু কথা বলার পর, স্যার আমার কাছে জানতে চাইলেন পড়াশুনা করছি কি না। তখন স্যারকে বললাম, আমি পড়াশুনা করি না। তিনি প্রশ্ন করলেন, কেন ও কোন পর্যন্ত পড়াশুনা করেছি? এবার উত্তরে বললাম, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত। কিন্তু কেন পড়ছি না তার কোনো জবাব কিংবা উত্তর ছিলো না আমার কাছে। পরে স্যার বললেন, আমার এই প্রতিষ্ঠানে অনেক ছেলে মেয়ে আছে যারা অনেক কষ্ট করে পড়াশুনা করেছেন ও করছে। তারপর স্যার আমাকে চারটি ছোট উপন্যাস ও দুইটি ডায়েরি দিয়েছিলেন। আর সাথে দিয়েছিলেন দু'চোখ ভরা স্বপ্ন ও শিক্ষা জগতের প্রদীপ। তারপর স্যার ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির খোঁজ দিলেন। তখন আমার মনে হচ্ছিল, একটি তারা পৃথিবীতে নেমে এসে আমাকে ছাত্র জীবনের দিকে ও স্বপ্নের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।

এখানে কিছু কথা না বললেই নয়, আসলে ছোটবেলা থেকেই প্রতিটি মানুষের স্বপ্ন থাকে। সেই স্বপ্ন নিয়ে তারা বড় হয়। তেমনি আমারও একটি স্বপ্ন ছিলো। আমি বড় হয়ে একজন ডাক্তার হবো। স্বপ্ন পূরণের জন্য বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হলাম। স্বাভাবিকভাবে পড়াশুনা ঠিক

মতোই চলছিল। হঠাৎ এক দমকা হাওয়ায় সবকিছু এলোমেলো হয়ে গিয়েছিলো। আমার স্বপ্ন শেষ। আর লেখাপড়া করার ইচ্ছাকে কোনোভাবে জাগ্রত করতে পারছিলাম না। সহপাঠীরা অনেকেই অনেক বুঝানোর পরেও উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। সময়ের সাথে সাথে সবাই তাল মিলিয়ে চলছে শুধু পড়ে আছি আমি। মাঝে মাঝে ছাত্র জীবনের জন্য খুব কষ্ট হতো। সেদিন শ্রদ্ধেয় স্যারের কথায় এত উৎসাহ পেয়েছিলাম। যাই হোক, স্যারের কথা মতো ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে গেলাম। যখন ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ করছিলাম তখন দেখতে পেলাম কিছু ছাত্রছাত্রী ও দুজন শিক্ষক মিলে প্রোগ্রামের জন্য স্টেজ তৈরি করছে। তখন মনে হচ্ছিলো আমিও যদি লেখাপড়া করতাম! তারপর দুজন শিক্ষকের মধ্য থেকে একজন শিক্ষক পরিচয় নিয়ে অফিস রুমের পথ দেখিয়ে দিলেন। অফিস রুমে যাওয়ার পর তাঁরা কিছু কথা বলার পর, কিছু প্রশ্ন করলেন। উত্তরগুলো জানা ছিলো তাই সমস্যা হলো না। উত্তরগুলো সঠিকভাবে বলে দিলাম। কিন্তু সমস্যা ছিলো দুই জায়গায়। সপ্তাহে পাঁচদিন ক্লাস তার তিন/চারদিন উপস্থিত থাকতে হবে। পরের সমস্যা হলো সকাল দশটা থেকে ক্লাস করতে হবে। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির পরিবেশটা খুবই সুন্দর ছিলো।

এরপর খোঁজ করলাম অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে। কিন্তু সব জায়গায় একই কথা, ক্লাস করতে হবে। তারপর কোন উপায় না দেখে ওপেন ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি বিভাগে ভর্তি হলাম। তবে ডিগ্রিতে পড়াশুনা করার ইচ্ছা ছিল না। ডিগ্রি যে খারাপ তা নয়। ডিগ্রিও ভালো। কিছুদিন পর আমার সহপাঠীদের একজন ফোন দিয়ে বললো, "ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ" এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইভিনিং শিফ্‌ট আছে আর সপ্তাহে তিন দিন ক্লাস। এই ইউনিভার্সিটির পরিবেশটা ভালো ও সুযোগ সুবিধা রয়েছে। কোনকিছু না ভেবেই ভর্তি হয়ে গেলাম। আমার মনে হয়েছিল এখান থেকে আল্লাহর রহমতে ভালো কিছু করতে পারবো। সর্বশেষ একটা কথা শ্রদ্ধেয় এমদাদুল ইসলাম স্যার যদি ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির খোঁজ না দিতেন, তাহলে এতটা পথ হাঁটতে পারতাম না আমার স্বপ্নের জগতে। আমি আশা করি যেকোনো ভালো উৎসাহ মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করে। তাই আমার ছোট জীবনের ছোট একটি কাহিনী এই লেখনির পাতায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র।

স্মৃতিকাল

ইথার আখতারুজ্জামান
প্রাক্তন সিনিয়র অফিসার, মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং
ব্যাবিলন গ্রুপ

আমাদের শেষের দিনগুলো তখন বলতে গেলে
ওয়াকিং ডিসটেন্স ধরে বিচ্ছেদ এর পথে এগুচ্ছে
ইচ্ছে করেই ভ্রমণ দীর্ঘ করি, উল্টো পথ ঘুরে।
প্রেমের আয়ু ঘড়ির পেন্ডুলামে ঝুলিয়ে রাখি,
যেমন আধমরা একটা গোল্ড ফিস
একুরিয়ামে জিইয়ে রেখেছিলাম অনেকদিন।
করুণা করে হলেও যদি বেঁচে ওঠে!

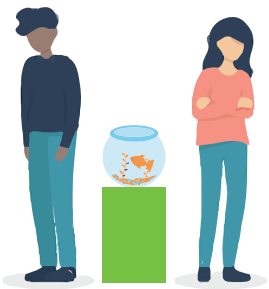

কী ভীষণ বিস্ময়ে তখন তোমার চোখের পাল্টে যাওয়া দেখি!
আমাদের আঙুল ছোঁয়ানো দিনগুলো,
মুঠোফোনে নিঃশ্বাস গোনা রাতগুলো,
সান্ত্বনাস্বরূপ একটি স্মৃতিকাল পেল।

এরপর একদিন হুট করে দেখি;
আমাদের বাড়ি ফেরার ট্রেনটা
বুকের এক অন্ধকার স্টেশনে হুইসেল ছাড়াই থেমে গেল।

না বলা কথা

শরীফ রাজ
সিনিয়র ম্যানেজার
হিউম্যান রিসোর্সেস
ব্যাবিলন গ্রুপ

থাক না, কিছু কথা লুকানো।
যেমন মেঘ আকাশকে লুকিয়ে রাখে,
আমি না হয় তাই।

চাই না, আকাশ ছুঁতে,
চাই শুধু মুক্ত আকাশে দাঁড়িয়ে
আকাশের ভিতরে দিগন্ত বিস্তৃত
আকাশকে অবলোকন করতে।

থাক না, কিছু কথা লুকানো।
যেমন রাতের অন্ধকার নীলাভ শুভ্র
আকাশকে লুকিয়ে রাখে,
আমি না হয় তাই।

চাই শুধু আকাশের মত দিগন্ত বিস্তৃত মন,
আর তারাদের সাথে রাতের
অন্ধকারে জ্বল জ্বল করে জ্বলে
দিনের আলোতে হারিয়ে যেতে।

থাক না, কিছু না বলা কথা,
লুকানো।

প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন (ওডি)- গন্তব্য নয়, একটি যাত্রা

মো. মিনারুল আকবর
গ্রুপ জেনারেল ম্যানেজার
এইচআর, অ্যাডমিন অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

পাঠশালা পর্ব-১

পাঠকমণ্ডলী, বিষয়বস্তুর সাথে মিলিয়ে পড়তে গেলে এ লেখার সামঞ্জস্যতা খুঁজে পাওয়াটা একটু ঝামেলার ব্যাপার হবে। অর্থাৎ, নামকরণের স্বার্থকতা প্রথম কয়েক পর্বে পুরোপুরি আসবে না। আমি পাঠশালা কথাটা উল্লেখ করলেও আপনাদের মনের গভীরে কথাগুলো খোদাই করার অভিপ্রায়ে বাস্তবতা ও নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে গল্প আকারে এ লেখাতে বন্দি করতে চেষ্টা করে যাবো ধারাবাহিকভাবেও। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ এই লেখা পড়বে বলেই এই পাঠশালার একটা বিরাট অংশজুড়ে মিশে থাকবে মন-মনন-মানসিকতা। লক্ষ্য নির্দিষ্ট রাখতে হয় কিন্তু পথ এদিক সেদিক হতে পারে– আমরা অভিষ্ঠ লক্ষ্যেই পৌঁছবো তবে শুধু কঠোর তাত্ত্বিকতা দিয়ে নয়। যদি নজরুলের ভাষায় বলি "মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য।"

দীর্ঘদিন বাংলাদেশের গার্মেন্টস সেক্টরে নিবিড়ভাবে কাজ করার সুবাদে গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল এর আলোকে লেখাটা; আর শ্রমঘন এ শিল্পে আটষট্টি হাজার গ্রাম থেকে বিভিন্ন পরিবেশ, পেশা ও বয়সের লোকের বন্দর এ শিল্প– তাই অন্য শিল্পে কাজ করলেও এর অভিজ্ঞতার আলোকে লিখলে অনেক অনেক উদাহরণ তত্ত্বের সাথে মিলানো সম্ভব হবে। এ শিল্পে সুইপার হতে শুরু করে অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, প্রাক্তন সামরিক অফিসার, প্রকৌশলী ও ডাক্তার ইত্যাদি একত্রে একটি বলয়ে কাজ করে- এ সুযোগও বা হাতছাড়া করি কেন বলুন তো! প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে আসতে হলে বাংলাদেশের এই শিল্পের কিছু রূঢ় বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিবিড়ভাবে ভাবতে হবে। তাত্ত্বিকভাবে প্রশাসনের বই ম্যানেজমেন্ট, মানবসম্পদের জন্য বই হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট আর কম্প্লায়েন্সের জন্য কোনো বই নেই, কারণ যে যার জায়গাতে ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলছে কিনা তাই কমপ্লায়েন্স।

ঝুট শিল্পকালীন সময়ে প্রশাসনিক দপ্তর ও পার্সোনেল বিভাগ প্রচলন থাকলেও আস্তে আস্তে মানব সম্পদ বিভাগের সূচনা হয়। প্রথমদিকে বায়ারের অডিটের গণ্ডি ছিলো শ্রম-আইন তাই মানব-সম্পদ সম্পর্কিত বইয়ে যদি ২০টি অধ্যায় থাকে তার ১৭তম অধ্যায়ে হয়তো শিল্প-সম্পর্ক অধ্যায়ের "গ" উপ-অধ্যায়ে থাকে স্থানীয় শ্রম আইন। কিন্তু রপ্তানী আদেশ পেতে তাই বায়ারের অডিট পাশ করতে যেয়ে বাংলাদেশের এইচআর বিভাগের কর্মীগণ বাকি

১৯টি অধ্যায়ের চর্চা করার অবকাশ কমই পেয়েছে। এর সাথে আর দুই কি তিনটি অধ্যায়ে সর্ব্বোচ্চ সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছে। ফলে এ শিল্পের মানব-সম্পদ চর্চা তেমন হয়নি। পাশাপাশি ইন্টারভিউতে গেলে আগে শ্রম-আইন, এর পর অগ্নি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির প্রশ্নবাণে তরুণ প্রজন্মতো দূরের কথা, এখন যারা মানব-সম্পদ বিভাগে বসে আছেন তারাও সারাদিন শ্রম-আইন ধারায় ব্যস্ত। আর এইচআর ছেড়ে তরুণরা অন্য প্রতিষ্ঠানে কম্প্লায়েন্সে চলে যাচ্ছে। ফলে শ্রম বাজারে এইচআর কর্মকর্তা থেকে কমপ্লায়েন্স-এইচআর দিয়ে ভরা। ঠিক যেমনটি অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে মার্চেন্ডাইজার থাকলেও বর্তমানে মার্চেন্ডাইজার গার্মেন্টস খাত যেন কপিরাইট করে নিয়েছে।

এসবের ভিড়ে অনেক মালিক প্রায় অনেক আগে থেকেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স পৃথক করে রেখেছে। কিন্তু যেহেতু এদেশে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানিকে অনেকে কপি করতে যায় তাই কিছুটা জগাখিচুড়ি অদ্যবধি বিরাজ করছে। যেমন- একটি বিদেশি স্বনামধন্য কোম্পানি তাদের ওয়েলফেয়ার অফিসারকে কমপ্লায়েন্সে রেখেছে। তাই আমি এটি এইচআর এ না রেখে কমপ্লায়েন্সে রাখবো। এভাবে উপরোক্ত তিনটি ভিন্ন বিভাগ কোনো কোনো ক্ষেত্রে একসাথে হয়ে কারো নিজস্ব অস্তিত্ব নেই। খরচের দিকে নজর রাখতে এক মহাব্যবস্থাপকের অধীনে পৃথক তিনটি বিভাগ পৃথকভাবে চলতে তো কোনো সমস্যা নেই। এখনো অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যাদের ঝুট ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নকর্মী, ড্রাইভার– মানব সম্পদ বিভাগ পরিচালনা করে।

আশার কথা, অনেকে কারো কথা শুনে এইচআর বিভাগের নামকরণ করছেন হিউম্যান ক্যাপিটাল ডিপার্টমেন্ট– জেনে নিন আগে যে আপনার অ্যাকাউন্টস বিভাগ মানব-সম্পদের বেতন লায়াবিলিটি খাতে রাখে, তারা কি এটা অ্যাসেট খাতে রাখতে শুরু করেছে কিনা! আবার অ্যাসেট খাতে রাখলে ডেপ্রিসিয়েশন কী ধার্য করবে! অত গভীরে বা তর্কে না যেয়ে যদি ধরেই নেই কোনো মালিকের তিনটি বিভাগ পৃথকভাবে তারা কি মাসিক মিটিং এ শুধু কতজন যোগদান করল ও কতজন বের হয়ে গেল তার হিসাব দেয়? তাদের কি কেউ জিজ্ঞাসা করে তুমি কতজন পরোক্ষ শ্রমিককে প্রত্যক্ষ শ্রমিক বানাতে পেরেছো? তুমি অপারেশন ওয়াইজ লোক নাও, না শুধু মাথা দিয়ে ফ্লোর ভরাও? তোমার রিক্রুটমেন্ট খরচ গত বছর থেকে এ বছর কী উন্নতি হলো, তোমার ট্রেনিং এর রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট কী?

এবার যদি একটু দৃষ্টি দেই বলয়ের অন্য প্রান্তে এইচআর ও কমপ্লায়েন্স সম্পর্কিত অনেক গ্রুপ হয়েছে। কমপ্লায়েন্স ট্রেনিং এর ভিড়ে কিছু ট্রেনিং হচ্ছে স্ট্রাটিজিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, হিউম্যান ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে। দফায় দফায় সেমিনার হচ্ছে কীভাবে এইচআর বিজনেস পার্টনার হবে? এইচআর যদি মাঝে মধ্যে সকালে উৎপাদনের মর্নিং মিটিংয়ে না থাকে, মাঝে মধ্যে যদি পিপি মিটিং-এ না থাকে, যদি না বোঝে যে তার প্রতিষ্ঠানে ক্রিটিক্যাল প্রসেস কী ইত্যাদি, তবে কীভাবে বুঝবে পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট কার কেমন? এইচআর যদি বাজেট ও বুলেটিন এর পার্থক্য না বোঝে তবে বিজনেস পার্টনার

হবে কী করে? বহু নজির এমন আছে যে, বেতন বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রেড বদল করে উপরের গ্রেডে তুলে দিচ্ছি- খাতায় স্কিল ভর্তি কিন্তু কন্টেইনার দাঁড়িয়ে আছে সাত ঘণ্টা, আর মাল রয়েছে এখনো সুইং এ। আবার সরকার গেজেট দিলেই তারা পড়ে যাচ্ছেন বিপদে। কারণ সব তো তুলে রেখেছেন প্রথম কাতারে! বিভিন্ন পর্বে আস্তে আস্তে এসব বিষয়ে বিশদ আলোকপাত করবো, যতটুকু দেখেছি বা দেখছি তার উপর ভিত্তি করে। এখন আসি আমাদের আসল বিষয়ে, প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের বিষয়ে আসতে গেলে আস্তে আস্তে মানুষের ভিতর ঢুকতে হবে, কারণ একটি প্রতিষ্ঠানে যা কিছুই থাকুক না কেন- প্রাণ কিন্তু একমাত্র মানুষের আছে, মালপত্র, মেশিন ইত্যাদির নেই। আর এই প্রাণ সম্বলিত মানুষের মন- মস্তিষ্ক একটি প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক বিষয়কে প্রভাবিত করে প্রতি পদে পদে। শুধু তাই নয়, মনে নেই কোথায় যেন পড়েছিলাম– "মানুষ মরে গেলে পঁচে যায় আর বেঁচে থাকলে বদলায়" আর তাই প্রতিষ্ঠানে থাকতে থাকতে সে বদলাতে শুরু করলেতো কথাই নেই। মৃত্যুও পরিবর্তন যেমন সত্য, তাই পরিবর্তন নিয়ে কথা থাকবে এ লেখার পরতে পরতে।

ছোটবেলায় সন্ধিবিচ্ছেদে যারা পড়েছি শ্রম+আনন্দ = শ্রমানন্দ। এই ধারাবাহিক লেখাটির গভীরতা তারাই উপলব্ধি করতে পারবেন সাধারণ পাঠকের চেয়ে যারা শ্রমেই আনন্দ খুঁজে নিতে জানেন। "আপেক্ষিক" বলে একটি শব্দ আছে। আসলে বিজ্ঞানও অনেক ক্ষেত্রে আপেক্ষিক। চাকুরি জীবনে ঢুকে একটি ইংরেজি কথা সব সময় শুনতাম, "বিজনেস সিক্রেসি" যা পরববর্তীতে রূপান্তরিত হলো "বিজনেস ট্রান্সপারেন্সিতে।" তখন গুরুজনেরা বলতো "বৃত্তের বাহিরে এসে চিন্তা করো" এর কিছুদিন পর তারাই বলতে শুরু করল "চিন্তা করো কোনো বৃত্তই নেই– উন্মুক্তভাবে ভাব।" এনালগ যুগে জন্মে ডিজিটাল যুগের আংশিক মজা পাবার আগেই দেখলাম ভার্চুয়াল যুগ আসতে যাচ্ছে তাই- এ আপেক্ষিকতাকে মাথায় রেখে একটি কথা বলে নেয়া ভালো যে, আমি ছাত্রজীবনে যদি কোনো বইয়ের ৪র্থ তম প্রকাশনা পড়ে থাকি কিন্তু বাস্তব জীবনে কাজ করতে করতে অনেক বছর পরে যদি একই তত্ত্বে থাকি তবে তা হবে ভুল, কারণ ততদিনে আমার সেই লেখক তার ১৭তম প্রকাশনায় অনেক পরিবর্তন এনে ফেলেছেন কিন্তু আমি রয়ে গেছি সেই আগের ৪র্থ প্রকাশনায়।

এই লেখাটিও কোনো এক সময় অনেক আদি কথা মনে হবে। আজ আমরা ইন্ডাস্ট্রি চার এ অবস্থান করছি কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি এক এর যুগে অনেক কিছুই অসম্ভব মনে হতো। একটু তত্ত্ব কথা বলে নিয়ে আবার গল্পের ভিতর অবগাহন করব। প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন দুটি ভিন্ন কথা বা তত্ত্ব। আমরা এখানে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন নিয়েই লেখাটি অব্যাহত রাখব প্রাথমিকভাবে। প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কোনো গন্তব্য নয়, মনে রাখতে হবে এটি একটি অবিরাম যাত্রা। আগেকার দিনে মা-বোনেরা উল সুতা দিয়ে সোয়েটার, শাল ইত্যাদি বানাতো। প্রতি সেলাই বা কাঁটার বুননে যে মায়া বিঁধিত থাকতো তেমনি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি ও উন্নয়নে মায়া, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ও পরিকল্পনা নিতান্তই অপরিহার্য।

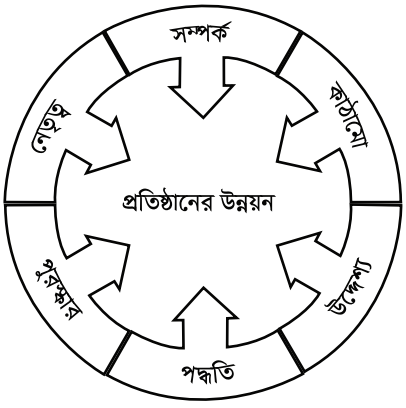

প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন (ওডি) এর জনক কার্ট লেউইন (১৮৯৮-১৯৪৭) হলেও এটি প্রয়োগ তার মৃত্যু পরবর্তীকালে ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি শুরু হয়। পরবর্তীতে এটি বিবর্তনের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলে নেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে "প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন" ও "প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন" দুটি ভিন্ন ধারা, সূক্ষ্মভাবে তাই এটি অনুধাবন করতে হলে নিচের ছকের দিকে একটু দৃষ্টি দিলে আমরা আপাত ভাবে পরিষ্কার হতে পারবো যদিও পরীক্ষা নিরীক্ষার শেষ নেই তাই এই তত্ত্বগত সংজ্ঞারও পরিবর্তন আসতেই পারে।

প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন	প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়ন
এটি একটি প্রতিষ্ঠান জুড়ে প্রচেষ্টা যেমন– কীভাবে এটি কাজ করছে, এখানকার কর্মীগণের বিশ্বাস/ উপলব্ধি কী, যা ধীরে ধীরে এই প্রতিষ্ঠানকে সুদূরপ্রসারীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে ও যুগোপযোগী রাখবে। অর্থাৎ, এটি প্রসেস, সিস্টেম, স্ট্রাকচার তথা সামগ্রিক-ভাবে প্রতিষ্ঠান নিয়ে বিবেচনা করে।	এটি একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশের গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে আনুমানিক আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে শিক্ষিত লোকবল ভিড় জমালেও নব্বই দশক থেকে মোটামুটি এর পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। এমনকি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়াররা বেশ ভালোভাবেই এ শিল্পে ঝুঁকেছে, যা অবশ্যই এ শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে প্রায় শুরুর দিক থেকে জুট-মিলসহ এসব শিল্পে পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট বিভাগ চালু ছিলো, কালের বিবর্তনে এটি এখন এইচআর বিভাগ নামে পরিচিত। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মালিকগণ শুরুর দিকে "আমার এইচআর ও আইই ডিপার্টমেন্ট আছে" গর্বের সঙ্গে বিভিন্ন ফোরামে বললেও বাস্তবতায় তাদের শো-পিস হিসেবে ব্যবহার ও কাউকে না কাউকে তো দোষারোপ করতে হবে, সেজন্য ব্যবহার করে যাচ্ছিলো। এখনও এ শিল্পে বহু প্রতিষ্ঠান এ ধারা থেকে বের হয়ে

আসতে পারেনি। যেমনটি ফার্মাসিউটিক্যালস, ভারী শিল্পগুলি এই দুটি বিভাগের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করে টেকসই ব্যবস্থাপনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় গত ৭/৮ বছর যাবত অনান্য শিল্পের মতো এ শিল্পেও "ওডি" বিভাগের প্রচলন লক্ষ করা যাচ্ছে। কিন্তু এ শিল্পে যারা ইতিমধ্যেই ওডি-এইচআর বিভাগ চালু করেছেন তারা এখনও ওডি হিসেবে তাদের ব্যবস্থাপকগণকে কাজের গণ্ডি তৈরি করে দেননি, এসব পেশাদার চেষ্টা করলেও অনুপ্রাণিত না করে অন্য দিকে ধাবিত করা হচ্ছে। আবার এটাও সত্য যারা ওডি পেশাদার হিসেবে কর্মে নিয়োগ করেছেন তারা কি জেনে বুঝে এটির জন্য গবেষণা বা প্রয়োগ করতে যাচ্ছেন? এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন এই "ওডি" বিষয়টি নিয়ে আমাদের প্রশিক্ষণ খুবই সীমিত। স্বপ্রণোদিত হয়ে যারা পড়াশুনা করছেন তারাও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অবকাশ পাচ্ছেন না বলে- এই লেখা তাদের সাহায্য করবে বলে ধারাবাহিকভাবে লেখাটি চালিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায় আছে। মনে রাখতে হবে ব্যবসায়ি-শিল্পপতি-উদ্যোক্তা কখনোই এক নয়। মালিকের মন-মানসিকতায় প্রতিষ্ঠানের গড়ন ভিন্ন থেকে ভিন্নতর হতে পারে। আবার কর্মীদের কেউ হয়তো পারে তাদের ভিতর পরিবর্তন নিয়ে আসতে তখন কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি অন্য আঙ্গিকে সাজতে পারে।

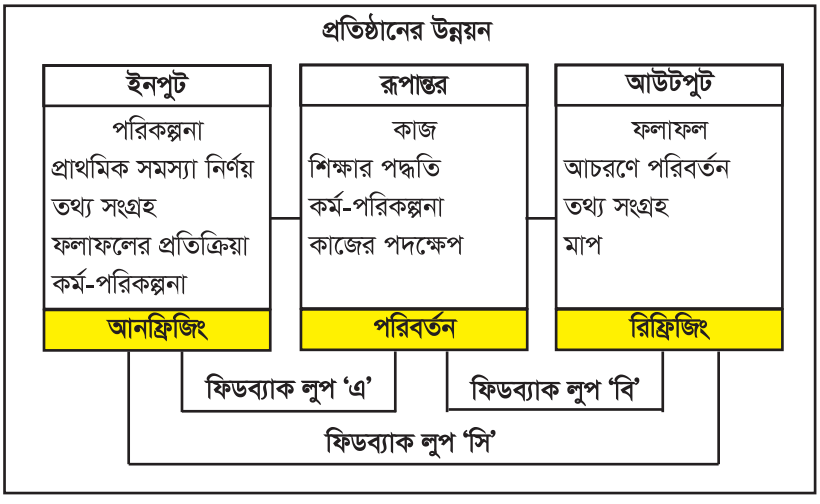

আমরা বর্তমানে ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ ভার্সনে পদার্পণ করেছি যেখানে ওডির ভূমিকা অনস্বীকার্য। নিচের চিত্রে এর সুস্পষ্টতা সুন্দরভাবে অনুধাবন করা যায়। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুল্যুশনের এই যুগে কম জোগানে বেশি ফলাফল নিশ্চিত করার ব্যাপারে তোড়জোড় চলছে। ১০০ পিস থেকে ১২০ পিস করা যাবে না যদি শুধু কাঁচামালকেই জোগান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। জোগান শুধু কাঁচামাল নয়– শ্রম, সময়, মেধা, দক্ষতা ও সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত বিনিয়োগ ও খরচ। অর্থাৎ এসব কিছুর প্রত্যেকটির পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জোগান ঠিক হলেই অল্প জোগানে বেশি ফল আসবে। আর তাই ওডি হয়ে পড়ছে আগামী পথ চলার অংশ। এ নিয়ে এ পর্বের শেষভাগে কিছুটা ধারণা পাবো। এরপর আবার নতুন ভার্সনের

দিকে ছুটব - এ ছুটে চলা অবিরাম।

যাহোক, সর্বদা বিবর্তন অব্যাহত থাকলেও "ওডি" কিছু মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত :-

১) মানবিকতাঃ এটি মানবিক মূল্যবোধ, গণতন্ত্র, অংশগ্রহণমূলক, সম্মতি, নীতিবাচক, মানবিক প্রতিভা এবং চ্যালেঞ্জ এর সাথে জড়িত।

২) প্রতিষ্ঠানব্যাপীঃ এটি প্রতিষ্ঠানব্যাপী কার্যক্রম হতে হবে। প্রত্যেক কর্মী, বিভাগ ও সামগ্রিকভাবে প্রতিটি দলের উন্নয়ন হতে হবে।

৩) সামগ্রিক অনুসন্ধানীঃ প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি অংশীদার অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে যে বিষয়ে কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত বা অসুবিধায় আছে। কীভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তা নিয়ে তৎপরতা চালিয়ে সঠিক ও টেকসই অবস্থায় আনা যায়, সেজন্য একের পর এক কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে বজায় রাখবে।

৪) উন্নয়নমূলক লক্ষ্য: প্রস্তুতিপর্বটা এমনভাবে হতে হবে, যেন সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির হয়, যা দ্বারা যে শিক্ষা অর্জিত হবে তা অবশ্যই সবার শিক্ষাকে আরো উপরের ধাপে নিয়ে পরিপক্ক করবে।

৫) পদ্ধতি কেন্দ্রিক: কৌশল, অবকাঠামো এবং সংস্কৃতি এমনভাবে মানুষ ও কারিগরি পদ্ধতিকে আপনা-আপনি সাজিয়ে নেবে, যা হবে উন্নয়ন লক্ষ্যকে অর্জনে সংঘবদ্ধ, স্বপ্রণোদিত ও উচ্ছ্বসিত। এজন্য ওডিতে নিয়োজিত কর্মীগণ একটি সুন্দরতম অবস্থান থেকে পরিবর্তন ও উন্নয়নের জন্য একটি পদ্ধতি বেছে নেন, যা মানুষ ও কারিগরি প্রক্রিয়ার দক্ষতা, কার্যকারিতা ও সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রায় উদ্যোমের জোগান দেবে।

৬) গবেষণা ও প্রমাণ সাপেক্ষ: ওডি বাস্তবতায় একটি প্রায়োগিক ক্ষেত্র, যা প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিকে ডাটা সংগ্রহ করে ভবিষ্যত কর্মধারার জন্য আগাম পরীক্ষা/ গবেষণা জাতীয় কাজকে ত্বরান্বিত করে রাখবে। ওডির জনক কার্টের এক্ষেত্রে একটি বহুল প্রচলিত উক্তি ছিলো, "কোনো পরীক্ষা প্রয়োগ ছাড়া নয়, আর প্রয়োগ পরীক্ষা ছাড়া নয়।" যেমনটি ভাষার উৎপত্তির প্রাথমিক ফল কথাবার্তায়– এটাই একটা জ্বলন্ত উদাহরণ এবং পরিবর্তনের ধারার অংশ।

পরিপক্কতা পেতে ওডিকেও পদ্ধতিজনিত ও প্রায়োগিক তিনটি তরঙ্গ স্তর পার হতে হয়েছে এবং এক্ষেত্রে তরঙ্গ স্বাভাবিকভাবে আরো আসবেই।

তরঙ্গ-১ (প্রথম প্রজন্ম ওডি- নির্ণয়সূচক ধারা) - এ পর্যায়ে ওডির মাধ্যমে গতানুগতিক ধারায় কিছু তথ্য উপাত্ত জোগাড় করে কোনো সমস্যার জন্য অনুসন্ধান, গবেষণা করে তার সমাধানের জন্য পরামর্শের মধ্যেই সীমিত ছিলো।

তরঙ্গ-২ (দ্বিতীয় প্রজন্ম ওডি - প্রায়োগিক শিক্ষার ধারা) - এ পর্যায়ে প্রথম ধারার উপর দাঁড়িয়ে প্রায়োগিক বিজ্ঞান ও শিক্ষানবিস প্রতিষ্ঠান তৈরি ছিলো একটি উদ্দেশ্য। এই তরঙ্গের মূলনীতি পর্যবেক্ষণকৃত তথ্যের উপর কাজ করে আচরণ ও প্রাপ্তির ভিতরের বৈষম্য নির্ধারণ। অর্থাৎ, একটি আন্তরিক প্রতিশ্রুতি থেকে প্রতিফলনের এবং আশানুরূপ প্রাপ্তির জন্য এইটুকু যাত্রাপথে জনগণের আচরণের পর্যালোচনা, প্রতিশ্রুতি ও আচরণ নির্ণয়, যাতে পদ্ধতিগত শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিশ্রুত ফলাফল অর্জিত হয়।

তরঙ্গ-৩ (তৃতীয় প্রজন্ম ওডি - সংলাপিক ধারা) - এ পর্যায়ে ওডি, যেখানে "পরিকল্পিত পরিবর্তন" সবর্দা সম্ভব নয় বরং সতত পরিবর্তন, পরিবর্ধন, জটিল, বহুমুখী সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও আগাম ভবিষ্যতকে কল্পনায় নিয়ে সুদক্ষ কর্মী বাহিনীকে নতুন নকশা, পদ্ধতি ও দূরদর্শী ক্ষিপ্রমানসম্পন্ন একত্রে দলীয় প্রচেষ্টায় মনোনিবেশে তৎপর রেখে টেকসই উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে হয়।

ওডির বৈশিষ্ট্য: প্রাথমিকভাবে ওডির কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেমন:
১. ওডি-র দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সংস্কৃতি, কর্মী ও পদ্ধতির উপর।

২. সুনির্দিষ্টভাবে ওডি প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব ও সদস্যবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে যৌথভাবে সংস্কৃতি ও পদ্ধতির উন্নয়নে।

৩. বিভিন্ন টিম বিশেষত যারা ওডি-র কাজ ও লক্ষ্যের দিকে কাজ করে যায় তাদের ধারা অব্যাহত রাখতে হয়ে থাকে।

৪. মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দিকে দৃষ্টি রাখতে ওডি-কে কখনো কখনো প্রযুক্তি ও অবকাঠামোর দিকে দৃষ্টি দিতে হয়।

৫. সিদ্ধান্ত নেয়া ও সমস্যা সমাধানে সকলের উদ্দীপ্ত অংশগ্রহণ ওডি-র বিশেষত্ব।

৬. ওডি-র সামগ্রিক পদ্ধতির পরিবর্তন ও প্রতিষ্ঠানকে একটি জটিল পদ্ধতি হিসেবে দৃষ্টির আওতায় রাখে।

৭. ওডি-নিয়ে কর্মরতরা সাহায্যকারী, সমন্বয়ক এবং সতীর্থদের ভোক্তার দিকে নজর রাখে।

৮. ওডি প্রতিষ্ঠানকে সর্বদা শিক্ষণীয়, যুগোপযোগী ও ক্রমবর্ধমান উন্নয়নশীল রাখার পরিবেশ সৃষ্টির দিকে নজর দিলেও চলমান প্রক্রিয়াকে প্রাপ্ত শিক্ষা হতে উন্নততর সেবা দেবার জন্য কর্মীবাহিনীকে তৈরিতে নিবিষ্ট থাকে।

৯. ওডি ভোক্তার সদস্যদের সাথে কর্মপ্রণালীর পর্যবেক্ষণ মডেল ও সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিতে দৃষ্টি দেয়।

১০. কর্মী - প্রতিষ্ঠানের উভয়ের জন্য জয়ী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে দৃষ্টি দেয়।

ওডির সুবিধাসমূহ ঃ-

১। প্রতিষ্ঠানব্যাপী গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তন
২। প্রণোদনা সৃষ্টি করে
৩। উৎপাদনশীলতা বাড়ায়
৪। কাজের মাণ বৃদ্ধি করে
৫। কাজের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করে
৬। টিমওয়ার্ক বৃদ্ধি করে
৭। মনোমালিণ্য কমায়
৮। লক্ষ্যের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল হতে সাহায্য করে
৯। পরিবর্তনের চাহিদা তৈরি করে
১০। অনুপস্থিতি কমায়
১১। কর্মীর প্রস্থান কমায়
১২। ব্যক্তিক ও দলীয় শিক্ষার আগ্রহ তৈরি করে

ওডি ও এইচআর কীভাবে সম্পর্কিত ঃ-

ওডি ও এইচআর কীভাবে সম্পৃক্ত তা বলার আগে বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল খাতে অ্যাডমিন, এইচআর, কমপ্লায়েন্স বিভাগের চিত্রটা তুলে ধরা খুবই যুক্তিযুক্ত।

এবার সেই কাঙ্ক্ষিত ওডি ও এইচআরের সম্পৃক্ততা নিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। সাধারণত তাত্ত্বিকভাবে মানবসম্পদ যেভাবে কর্মী বাহিনী ব্যবস্থাপনায় জড়িত থাকে, ওডি সেক্ষেত্রে একটু উপরে উঠে প্রতিষ্ঠানের গঠন কাঠামো, এক স্তরের সাথে আরেক স্তরের গ্যাপ, বিভিন্ন বিভাগের ভিতর কাজের সমন্বয় ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে এইচআরের পথকে উন্মোচন করে রাখে। ওডি যেহেতু সকল বিভাগের সাথে আলোচনার মাধ্যমে স্বল্প-মধ্যম-দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলগত ব্যাপারে ওয়াকিবহাল থাকে তাই এইচআর বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে। যদিও ওডি ও মানবসম্পদ এর শিকড় একটাই- তাই ওডির বসবাস অনেক ক্ষেত্রে এইচআর এর ভিতর সুপ্ত অবস্থায় থেকে যায়। এইচআর যে জায়গায় খুব বেশি পরিমাণে পরিচালনায়

নিমজ্জিত থাকে সেখানে ওডি কৌশলগত থিম নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত মজবুতে ব্যস্ত থাকে। এটি একটা আভ্যন্তরীণ কনসালটেন্সির মতো, যা ক্ষেত্র বিশেষে বাহিরের উপযুক্ত কৌশলও প্রয়োগ করে বা পূর্ববর্তী কোনো ব্যক্তি বা দলের ধারণাকেও পরিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রকল্পে কাজে লাগায়। মানব সম্পদ বিভাগের কর্মীবৃন্দ যেমন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মীর আচার আচরণ, ব্যবহার নিয়ে কাজ করে, তাই মানব সম্পদ বিভাগের ওডি নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্র ব্যাপকতর। কেননা ওডির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যায়।

প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের কৌশল

রূপরেখা নিরূপন ও বাস্তবায়নের পাঁচটি ধাপ

শুরু	নির্ণয়	প্রতিক্রিয়া	সমাধান	মূল্যায়ন
সমস্যা, সুযোগ অথবা পরিস্থিতি উন্মোচন করা। ফলাফল হলো একটি ক্ষেত্র যা প্রাপ্তির আশায় একটি চুক্তি বা প্রকল্প হতে পারে	এটি ঘটনা অনুসন্ধানের পর্যায় যেখানে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে	তথ্য সমূহ উন্মোচনের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ফলাফল প্রাপ্তির উদ্দেশে পরিবর্তন নিয়ে আসার উপায় ও তা নিরূপনের জন্য তথ্যকে বিচার করা হয়।	ত্রুটি সংশোধন, শূন্যতা পূরণ, উন্নয়ন অথবা দক্ষতার উন্নয়ন বা সুযোগকে কাজে লাগানো। ফলাফল হলো একটি পরিকল্পনা বা প্রশিক্ষণের জন্য একটি পরামর্শ	প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটি নির্ণয় করা যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা থেকে সুনির্দিষ্ট ও প্রত্যাশিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য পরিমাপ করা যাবে কিনা

এর পরের পর্বে আমরা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজগুলি নিয়ে কীভাবে তাকে প্রতিষ্ঠানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়ে টেকসই প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাবো।

অপ্রস্তুত

প্রদীপ কুমার দত্ত
প্রাক্তন ডিজিএম
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

ষড়যন্ত্র শব্দটা শোনামাত্রই আমাদের পিলে চমকে ওঠে। এমনই একাধিক ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হয়েছিলো গৌতমের। ষড়যন্ত্র না বলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার শিকার বলাই ভালো। গৌতমের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বর্ণনা করি। তখন সে কলেজের চতুর্দশ বর্ষের বিজ্ঞানের ছাত্র। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের গ্রামের ছেলে। স্বভাবে সহজ সরল, কিন্তু পড়াশোনায় মেধাবি। কলেজের পাশেই এক মেসে থাকে। তার সাথে একই রুমে আরও দুজনসহ মোট তিন জন ছিলো। বাকি দুইজন আজিজ এবং বিমল। ফাইনাল পরীক্ষা প্রায় শেষ। শেষদিন পদার্থ বিজ্ঞান ব্যবহারিক পরীক্ষা দিতে যাবে। কিন্তু মেসে সে প্রস্তুতি নেওয়ার প্রাক্কালে আকস্মিকভাবে তার দৃষ্টিগোচর হয়, তার যে তিনটি পরার উপযোগী শার্ট রয়েছে এর একটাতেও কোনো বোতাম নেই। সবগুলো বোতাম কেটে কে বা কারা শার্ট ব্যবহারের অনুপযোগী করে রেখেছে। তার পরার মতো শার্ট আর একটাও বাকি রইলো না। ঘটনার আকস্মিকতায় সে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে।

তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে, হাতে সময় প্রায় একদম নেই। কী করা যায়? পাশের কক্ষে যেয়ে অন্য আরেক বন্ধুর কাছ থেকে একটা শার্ট ধার নেয়। সাইজে একটু ছোট, কিন্তু আপাতত কোনোরকম কাজ চলবে। পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা। সাথে নিয়ে যেতে হবে ব্যবহারিক খাতা, ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স, একাধিক কলম ও পেন্সিল। স্টিলের ফুট স্কেল। সাথে একটা রুমাল। তাড়াহুড়োর মধ্যে পাছে আবার প্রয়োজনীয় কোন জিনিসটা ফেলে রেখে চলে যায়। মানসিক স্নায়ুচাপ বাড়ে। কোনোরকমে দ্রুত তৈরি হয়ে পায়ে হেঁটে রওনা দেয়। বিশ মিনিটের রাস্তা। কিছুদূর যেতেই খেয়াল করে পরীক্ষার এডমিট কার্ডটাই ফেলে এসেছে। ফিরে গিয়ে কার্ডটা নিয়ে এসে সে আবার ছুটতে ছুটতে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা। গন্তব্যে পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গেলো। ইশতারা ম্যাম তাকে দেখামাত্রই ক্ষেপে গেলেন। আজকের পরীক্ষায় ইশতারা ম্যামই ইন্টারনাল পরীক্ষক। এক্সটারনাল পরীক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত বিভাগীয় চেয়ারম্যান। পরীক্ষা ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। দেরি হওয়ার কারণে তাকে

অনুমতি গ্রহণের জন্য নিজ কলেজের বিভাগীয় চেয়ারম্যান এর মাধ্যমে এক্সটারনাল স্যারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়েছে। এক্সটারনাল স্যারের কাছ থেকে অনুমতি পেতে তেমন বেগ পেতে হয়নি। দেখা করার সাথে সাথে সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু নিজের কলেজের চেয়ারম্যান স্যারের কাছ থেকে দেরির কারণ ব্যাখ্যা করা এবং জেরার জবাব দিতে গিয়ে মন চাইছিলো পরীক্ষা না দিয়েই ফিরে যেতে। শেষ পর্যন্ত ধৈর্য্যধারণ করে মেসের অপ্রীতিকর ঘটনার সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সবুজ সংকেত লাভ করে। একে তো দেরি, তার উপর হয়রানি ও পেরেশানি সব মিলে একেবারে বিপর্যস্ত অবস্থা। ভাগ্য তার সুপ্রসন্ন, যে এক্সপেরিমেন্ট তার বরাদ্দে জুটেছে সেটি সহজেই প্রসেসিং করে অনুশীলনীর ফলাফল মিলিয়ে একটা গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছে গেল সে। এক্সটারনাল স্যার তার এক্সপেরিমেন্টের উপস্থাপনা দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। হাতে সময় কম। ঝটপট এক্সপেরিমেন্টের বৃত্তান্ত খাতায় লিখে শেষ করে পরপর মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়।

মেসে ফিরে এসে দেখে আর এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেছে। তার টেবিলে রাখা সব বই খাতা একটিও নাই। সব উধাও। কী হয়েছে এগুলো? কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। শুধু বই-ই নয়, বই এর পাতার পরতে পরতে ভাঁজ করা কিছু টাকাও ছিলো। সেগুলোও তাহলে নাই। এখন কী হবে। এসব ভাবতে ভাবতে মাথাটা চক্কর দিয়ে ঘুরে যায়। রুমে অপ্রত্যাশিত এ সব কী কাণ্ড শুরু হলো? সেদিন সকাল থেকেই মেজাজটা খারাপ। একটার পর একটা তাজ্জব ঘটনা। এর পিছনে রহস্য কী? যদিও আজকে বহুল প্রতীক্ষিত পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তার কত পরিকল্পনা ছিলো। শীঘ্রই গ্রামের বাড়ি ফিরবে। কয়েকদিন বিশ্রাম করে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্যে জোর প্রস্তুতি নেবে। কিন্তু না, এখন সে কিছুই ভাবতে পারছে না। রুমমেটদের জিজ্ঞেস করেও কোনো সদুত্তর পায় না। উল্টো আজিজ আর বিমল এক জোট হয়ে এ ঘটনার দায় গৌতমের উপরই চাপাতে চায়। আজিজ বলে উঠে, তুমি নিজেই ঘটনা সাজিয়ে দোষ চাপাতে চাইছো। - ও মা, সে কী কথা! এতে আমার কী লাভ। তীব্র বাদানুবাদ, চিৎকার-চ্যাঁচামেচি, এক পর্যায়ে হাতাহাতি। চূড়ান্ত পর্বে বিমল ছুরি নিয়ে এক ঘা বসিয়ে দেয় গৌতমের বুকে। গৌতম রক্তাক্ত দেহে সাথে সাথে অচেতন হয়ে পড়ে।

এ ঘটনার কিছুদিন আগের কথা–

দশম শ্রেণীর ছাত্রী নিপা। মাঝে মাঝে নিপাকে গণিত পড়াতে তাদের বাসায় যেত গৌতম। বিমলও নিপাকে দেখেছে। দেখতে সুশ্রী। বিমলের সুপ্ত ইচ্ছা হয় নিপার সাথে পরিচিত হতে। সেজন্যে অনেকদিন বিমল গৌতমকে অনুরোধ করেছে মেয়েটিকে মেসে নিয়ে আসার জন্যে। কিন্তু গৌতম এই প্রস্তাবে সায় দেয়নি। সেজন্যে তাদের মধ্যে এক ধরনের মনোমালিন্য ও তাদের সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

এদিকে ঘটনা প্রবাহে আজিজ আর বিমল ফন্দি আঁটে কী করে গৌতমকে একটা উচিত শিক্ষা দেওয়া যায়। তাই পরীক্ষার শেষ দিনটা ওরা বেছে নেয় উত্তম সুযোগ হিসেবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাদের পূর্ব পরিকল্পনা যে ঘটনার আকস্মিকতায় এমন রক্তাক্ত অবস্থায় রূপ নেবে, তা ঘুণাক্ষরেও কেউ ভাবতে পারেনি। পরিণতিতে পুলিশি তদন্ত, মামলা- মোকদ্দমা ও দায়ী ব্যক্তিদের জেল।

গৌতম প্রাণে বেঁচে যায়। দীর্ঘ চিকিৎসার পর আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠে। কিন্তু পড়ালেখা আর এগোয়নি। দীর্ঘদিন পর আজ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বিমলের আত্মোপলব্ধি জন্মেছে যে সেদিন আবেগের বশে যে কাণ্ড ঘটিয়েছিলো, তা ছিলো জীবনের চরম ভুল। এমন একটা চরম ভুলের কারণে তার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় চলে গেছে। এ সময়টা জীবনে কখনো ফিরে পাবে না।

গৌতম দীর্ঘ সময় চিকিৎসা নেওয়ার পর এখনো বেঁচে রয়েছে। তার ভবিষ্যতের লালিত স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই রয়ে গেলো। তার মূল্যায়ন– জীবন চলার পথে অনেকের সাথে দেখা হবে, কিন্তু বন্ধু/ সাথী নির্বাচনে সতর্ক থাকা জরুরি। কেননা কথায় আছে– "সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।"

পটু মিয়ার খেল

জামাল হোসেন
ডেপুটি ম্যানেজার, সবজি বীজ বিভাগ
ব্যাবিলন এগ্রো অ্যান্ড ডেইরি লিমিটেড

নাইম আনসারী মোটামুটি সচ্ছল কৃষক। ছোটবেলায় অভাব অনটনে দিন কাটলেও নাদুস নুদুস এক হালি ছেলের বাবা হওয়ায় তার কপাল খুলেছে। ছেলেরা যেমন কর্মঠ তেমন মিতব্যয়ী, আবার বাবার অনুগত। স্কুল, কলেজে লেখাপড়া করতে না পারলেও মাঠের কাজের কলাকৌশল ভালোই আয়ত্ত্ব করেছে। আবার সৃষ্টিকর্তার কৃপাও যেনো আসমান থেকে নেমে আসে আনসারী চাচার ফসলের জমিনে। কিছু পৈতৃক, কিছু বর্গা জমাজমি চাষ করতে করতে এখন নিজেরই বিঘা বিশেক জমি হয়েছে। বেশ মোটা তাজা দুই জোড়া হালের গরু, দুধেল গাভী, ছোট ছোট আরো দুটো বাছুর সব মিলে তার গোয়াল ঘরটা পরিপূর্ণ। আবার বাড়ির আঙিনাটাও বেশ বড় করতে পেরেছে। বসত ঘর ছাড়াও শাকসবজি, ফলফলালি ভালোই ফলায়।

অভাব-অনটনের সাথে লড়াই করে বড় হওয়া। মনটাও খুব সরল-সহজ। তাই অভাবী মানুষের মলিন মুখ তাঁর দিলে আঘাত করে। এলাকার মানুষও প্রয়োজন পড়লেই নাইম চাচার দরজায় টোকা দেয়। চাচা কাউকে অখুশি করে না। সাধ্যমতো সহযোগিতা করে। একান্তই না পারলে দুটি মিষ্টি কথা, সদুপদেশ দিয়ে বিদায় করে। তাইতো মসজিদের খতিব রহমত মৌলবি আদর করে নাইম এর সাথে 'আনসারী' অর্থাৎ 'সাহায্যকারী' বিশেষণ যোগ করে। সেই থেকে তিনি নাইম আনসারী হয়ে যান। এলাকার সমবয়সী লোকেরা সহজ করে আনসারী বলে ডাকা শুরু করে। ধীরে ধীরে হুজুরের দেওয়া নামটি প্রসিদ্ধি লাভ করে।

পটু মিয়া এলাকার বিত্তবান মক্কেল মানুষ। মাঠে পৈতৃক, নিজের কবলা মিলে শত বিঘার বেশি হবে জমি। আবার বন্ধকী জমিজমা তো আছেই। তাছাড়া ব্যবসায়ী কারবারও আছে। সিন্দুকে নগদ টাকা সবসময় মজুদ থাকে। জমিজায়গা অল্প কিছু নিজে আবাদ করে আর বেশিটুকু বর্গাচাষিরা চাষবাস করে। গ্রামের অধিকাংশ পরিবারই ভূমিহীন কিংবা দুই এক বিঘা জমির মালিক। যাদের একটা দুইটা হালের গরু আছে তারা প্রায় সকলেই নিজের

অল্প-স্বল্পের সাথে আর কিছু বর্গা নিয়ে চাষ করে। মিয়া সাহেবের বর্গাদার অর্ধশতের বেশি বৈ কম হবে না। যার একটা গরু আছে সে অন্যের আর একটার সাথে জোড়া বেঁধে গাঁতা করে– আজ এ, কাল ও এভাবে পালা করে চাষাবাদ করে। চাহিদামতো উপকরণের যোগান দিতে না পারা, প্রাকৃতিক অসহযোগিতাসহ বিভিন্ন কারণে আশানুরূপ ফসল ঘরে আসে না। তাইতো অধিকাংশ বাড়িতেই ভালোমতো আহার জোটে না। পানতা মরিচ কিংবা শুকনা খিচুড়ি তাও কখনো কখনো পেট পুরে হয় না। আরো কষ্টকর হলো, ধান পাকার, পাট কাটার, আখ মাড়াইয়ের তিন চার সপ্তাহ আগেই এরা এমনভাবে ঠেকে যায়, সে ঠেকায় হাড়ুডুর জাঁদরেল খেলোয়াড় দলের সকলে মিলে ধাক্কালেও চুল পরিমাণও নড়ানো যায় না। কী আর করা, অগত্যা ছুটে যায় পটু মিয়ার কাছে। অতি বিনয়ের সাথে এক বস্তা চাল কিংবা পাঁচশ টাকার আবেদন করে। মিয়া সাহেব তো এই সুযোগের অপেক্ষায়ই সজাগ থাকে। নরম সুরে উহু-আহা করে অতি দরদী হয়ে বলে, "আরে তোর ছেলেপেলে না খেয়ে মরবে নাকি। এই নে চাল ডাল নিয়ে বাড়ি যা। আর শোন, টাকাটা আমার খুব বড় একটা কাজে লাগানোর কথা ছিলো, কিন্তু তোর এই দুঃসময়ে সেটা বাদ দিলাম। মাত্র পঞ্চাশটা টাকা ধরে দিস। টাকার যোগাড় না হলে পাট ধুয়ে আমার ঘরে দিস, পনেরোশ টাকা দরে হিসেব করে বাকিটা দিয়ে দিবো, কেমন!" বেচারার হাড় ভাঙা খাটুনির পাট, গুড় তিন চার সপ্তাহের জন্যে বাজার দরের দুই আড়াইশ টাকা কমে মিয়া সাহেবের ঘরে পৌঁছে দিতে হয়। এভাবে তার ব্যবসা ভালোই চলে।

আনসারী চাচার উত্তরোত্তর উন্নতি, মানবপ্রীতি পটু মিয়ার কি সহ্য হয়? গরিবের অবস্থার পরিবর্তন হলে তার সুদের কারবার, দাদন ব্যবসা সিঁকেয় উঠবে! স্বল্প টাকায় নেওয়া বন্ধকী জমিগুলো ছাড়িয়ে নেবে অনেকেই নিয়েছেও। শালিস দরবার, অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাঁর অবস্থান দুর্বল হতে শুরু করেছে। দিনে দিনে আনসারী চাচার পরিচিতি, উপস্থিতি বেড়ে যাচ্ছে। সব মিলে রীতিমতো হতাশায় আছে মিয়া সাহেব। অনেক রাতও নির্ঘুম কেটে যায়। জল্পনা কল্পনা, কলাকৌশল, ফন্দিফিকির কোনোটাই বাদ দেয় না। কিন্তু খেল জমে না। কী মুশকিল! তবে সে হাল ছাড়ার বান্দা নয়। কালী প্রসন্ন ঘোষের 'পারিব না' কবিতা স্মরণ করে, বিশেষ করে 'এক বারে না পারিলে দেখ শত বারে' চরণটি বারেবারে আবৃত্তি করে। মুভি সিনেমার খলনায়ক-নায়িকার পাঠগুলোতে বিশেষ মনোযোগ দেয়। সেভাবে প্র্যাকটিসও করে।

নির্বাচনের নাম গন্ধও নাই। হিসেবে এখনো দুই বছরেরও কিছু বেশি সময় বাকি। একদল লোক মাঠ চষে বেড়ায়, দেয়ালে দেয়ালে চিকা মারে, দোয়া চায়, ভোট চায়, মিছিল মিটিং করে। আনসারী চাচা তো অবাক! 'সাহেবের সাথে দেখা নাই, কানে কানে কথা' এ যেন সেই অবস্থা! ধানের খেত, সবজি বাগান, ফলফলালির গাছ, গরু বাছুর এসব নিয়ে যার এক দণ্ড অবসর নাই সে আবার মেম্বার প্রার্থী! নাহ, কখনো না।
মিয়া সাহেব পাক পিরিয়ডের আন্ডার মেট্রিক। কথাবার্তায় দারুণ পটু। যে কোনো ব্যাপারে

যুক্তি দাঁড় করানোর ওস্তাদ। সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য, দিনকে রাত, রাতকে দিন এভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করার মতো কথার জাদু সে জানে। তাইতো গ্রামের কেউ কেউ তাকে তামাশা করে পটু অ্যাখ্যা দিয়ে নানা কথা বলাবলি করে। পরে 'পটু'র সাথে মিয়া যোগ হয়। স্বার্থ আদায়ের সূক্ষ্ম কলাকৌশল, কূট বুদ্ধির দৌরাত্ম্যে আবু সাইদ মিয়া এখন পটু মিয়া। অবশ্য নব্য নামে তার কোনো রকম দ্বিধা সংকোচ বা আপত্তি শোনা যায় না। বরং স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে বলেই মনে হয়। সেই ব্যক্তি যখন আনসারী চাচার পিছে লেগেছে, সহজে কি ছাড়ে! নিজে পর্দার অন্তরালে থেকে লোকজন মাঠে নামিয়েছে। যথাযথ প্রশিক্ষণও দিয়েছে, প্রয়োজনে গাঁটের পয়সা খরচ করে। সহজ-সরল আনসারী চাচা এক সময় ঠিকই ফাঁদে পড়ে যায়।

পঞ্চাশ বছরের লম্বা জীবনে সে একবারও নির্বাচন নিয়ে ভাবেনি। মেম্বার, চেয়ারম্যান, এমপি, প্রেসিডেন্ট কত নির্বাচন পার করেছে একটা সিল দেওয়া ব্যতীত কিছু করেনি। কে হারলো, কে জিতলো সে খবরাখবরও রাখেনি, সেই আজ মেম্বার পদপ্রার্থী। তিনশো নেতা কর্মী গেল টাকা জমা দিতে। ভ্যান, নছিমন রিজার্ভ। গোস খিচুড়িও হলো।

ফাঁদে একবার পা দিলে, ফাঁদ কিন্তু ছাড়ে না। চাচা এবার শক্ত ফাঁদে। তাঁর টেলিভিশন প্রতীকের নেতা কর্মীর অভাব নাই। সন্ধ্যা নামলেই খণ্ড খণ্ড মিছিল। সে ফার্স্ট মেম্বার হবে এটা যেনো নিশ্চিত। শুধুমাত্র ঘোষিত দিনটির অপেক্ষা। ইতর খাঁ, চমক বিশ্বাস, ফালতু শেখ, ভোকাস মণ্ডল, ডান্ডি প্রামাণিক ছুটে আসে চাচার বৈঠক ঘরে। চা, পান, বিড়ি সিগারেট, জুস, এনার্জি ড্রিঙ্ক, ভাজা বিস্কিট প্রভৃতি জিনিসের বিলের চুতা হাজির করে। সাগরসম বিরক্তি আর প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীরবে বিলগুলি পরিশোধ করতে হয়।

গ্রামের মক্তবে ইয়াসিন হুজুরের কাছে নাম লেখা আর নামাজের সুরা কেরাত, দোয়া-দরূদ শিখতে না শিখতেই যাকে সংসারের হাল ধরতে হয়েছে, সে কি এসব ধান্দাবাজ মক্কেল-মাতব্বরের চালাকি-চতুরতা বোঝে। ঘরের বেড়ি ভর্তি ধান, মটকা ভরা চাল, বাইশ মটকা গুড়, পঞ্চাশ মণ পাট নিমিষেই হাওয়া হয়ে গেল। নির্বাচনের আরো দু'দিন বাকি। চাচার হাত শূন্য। আদর করে পোষা পনেরো কেজি দুধের অস্ট্রেলিয়ান গাভী আর পাঁচ বিঘা জমি বন্ধক রেখে শেষ দিনটি পার করলো কিন্তু মুক্তি পেল না। এখনো চা এর দোকানে দশ হাজার, সিগারেটের মহাজন লম্বা চুতা নিয়ে হাজির। চাচা খুবই ক্লান্ত, বিপদগ্রস্ত। সে নির্বাক! পরিবার পরিজন, শুভাকাঙ্খী প্রতিবেশির চোখে পানি। আর পটু মিয়ার মুখে মুচকি হাসি।

এ এক ভয়ার্ত পৃথিবী– তবুও যেন নেই মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন

মুহাম্মদ সাইফুল হক
প্রাক্তন এজিএম, মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং
ব্যাবিলন গ্রুপ

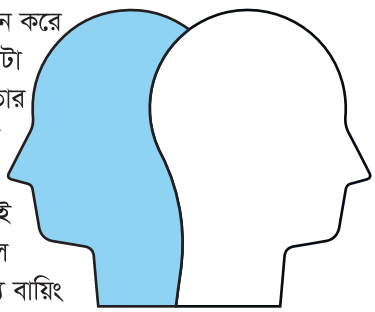

এইতো সেদিন আমার এক পেশাগত বন্ধু আমায় ফোন করে জানতে চাইলেন আমার এক সহকর্মী সম্পর্কে। বিষয়টা হলো, তিনি আমার সহকর্মীর বায়োডাটা পেয়েছেন তার কনিষ্ঠ ভগ্নির বিবাহ প্রার্থী হিসেবে। তাদের দুজনেরই গ্রামের বাড়ি একই জেলায় ও একই থানায় সামান্য দূরত্ব ব্যবধানে। সম্পর্কের ব্যাপারে অনেকটা এগিয়েই তিনি আমার সাথে সত্যতা যাচাই করছিলেন। আসলে তিনি কন্যার ভাই এবং বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য বায়িং প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে আমি বিষয়টাতে বেশ গুরুত্ব ও আন্তরিকতা দেখিয়ে আমার জানা সকল তথ্য জানিয়ে দিলাম। তাতে তিনি আশ্বস্ত ও খুশি হলেন। যাহোক, এর মাস দুয়েক পর জানতে পারলাম আমার সহকর্মী সেই কন্যাকে বিয়ে করে এসেছেন ২৬শে মার্চের স্বাধীনতা দিবসে। এসবই খুব স্বাভাবিক ও সুখের খবর কিন্তু অবাক ও ব্যথিত হলাম যখন জানলাম সেই বায়িং হাউসের বন্ধুর কাছে যে, আমার সহকর্মী কেবল বিয়েই করেননি বরং বিয়ের এক মাসের মধ্যে ডিভোর্সও করেছেন! স্বভাবতই তিনি আমার দেয়া ধারণাকে বিশ্বাস করে আজ ক্ষতিগ্রস্ত জানিয়ে অনুরোধ জানালেন সহকর্মীর সাথে মুখোমুখি শালিসে কারণ অনুসন্ধানে। বিষয়টি ব্যক্তিগত হলেও আমি রাজি হলাম মানবিক কারণে। এরপর তাদের আলাপনে আমি আমার সহকর্মীর যে ব্যক্তিত্বের সন্ধান পেলাম তাতে জীবনে আর কোনো মানুষের কেবল বৈঠকি চেহারা ও সামাজিক মর্যাদায় তাদের ব্যক্তিত্বের সনদ দেয়া থেকে বিরত থাকতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলাম। সবাই হয়তো ভাবছেন কেন এই বিবাহ বিচ্ছেদ এক মাসেরও কম সময়ে– তাই তো জানা হলো না। সত্যি কথা বলতে কি, হয়তো আমিও জানি না আসল কারণটা কী। কিন্তু যখন আমার সহকর্মী বিয়ের পরে কন্যার শরীরে অতিরিক্ত পশম আবিষ্কারে ভীত সন্তস্ত্র ও কন্যার পরিবারকে এজন্য ভর্ৎসনা করছিলো, তখন আমার ইচ্ছা হচ্ছিলো ওর কানটা ধরে অফিস থেকে বের করে দেই, কিন্তু আমি পারিনি। তবে ন্যূনতম দায়িত্ব হিসেবে আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। জানি না এরকম ব্যক্তিত্বের সহকর্মী আমার আর কতজন আছে!

এবার বলব একজন প্রতিবেশীর কথা। যিনি ঘটনাচক্রে আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কেও আবদ্ধ। আমরা দশজন মিলে আমাদের আবাস দালানের কেনা ১০টি ফ্ল্যাটে বসবাস করে চলেছি আজ এক যুগেরও বেশি সময়। সম্প্রতি জনা চারেক ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়েছেন নিজেরা অন্যত্র থাকার কারণে। আমার প্রতিবেশী ও আত্মীয় সাধারণত আমাদের সমিতির কোনো মিটিং এ আসেন না এবং কেবল আমার পরিবার ছাড়া আর কারো সাথে তাদের কোনো প্রতিবেশীসুলভ যোগাযোগও নেই। প্রয়োজনীয় কোনো অর্থ সংগ্রহ বা সামাজিক কোনো দরকারে তাদের অংশ পেতে সকলের গলদঘর্ম অবস্থা হয়। গত মার্চে পুরো বিল্ডিং-এ রঙ ও সংস্কারের কাজ করলাম মোটা অংকের টাকার মাধ্যমে। হঠাৎ দেখি তিনি বা তার পরিবার এসির এক্সটেরিয়র ঝুলিয়ে দিয়েছেন মানুষের মাথা বরাবর ঢোকা ও বেরোনোর রাস্তার গেটের উপরে, কারো সাথে পরামর্শের তোয়াক্কা না করেই। ঝড় বাদলে বা কোনো কারণে সেটা ভেঙ্গে পড়লে অবধারিতভাবেই মানুষ আহত হবার বা জীবননাশের আশংকা আছে। আর তাই সেই এক্সটেরিয়র অনতিবিলম্বে সরিয়ে ফেলার কঠোর দাবি জানালে যে মাস্তানিসুলভ আচরণের মুখোমুখি হলাম তা ছিলো আমার অকল্পনীয়। এ-দুটো ঘটনার দায় আমি নিজেও এড়াতে পারি না। সত্যি কথা বলতে এরাই তো আমার সহকর্মী, প্রতিবেশী, আত্মীয়-পরিজন। হতে পারে আমিও হয়তো ওরকম কিছু না কিছু অগ্রহণযোগ্য আচরণ লালন করে চলেছি নিজের অজান্তেই। কিন্তু কেউ বলছে না বলে সংশোধনও হচ্ছে না।

আগের উল্লিখিত ঘটনা দুটোকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলা যেতে পারে কিন্তু এবার যে ঘটনা উল্লেখ করব তা হলো জাতীয় অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশের প্রধান টিভি চ্যানেলগুলোতে সরাসরি বা ভিডিও সম্প্রচার হয়েছে। তাহলো কঠোর লকডাউন চলাকালে মহিলা ডাক্তার ও পুলিশের মধ্যে ঢাকায় সংঘটিত বাক-যুদ্ধ। কে, কাকে কত বেশি অসম্মান করে নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে তার সচিত্র প্রতিবেদন। নিজেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণায় এতটুকু কুণ্ঠা নেই তথাকথিত শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, প্রভাবশালী বা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত মানুষগুলোর। আমরা সেখানে দেখেছি স্বঘোষিত শ্রেষ্ঠত্বের উগ্র বয়ান, যা সারা জাতিকে লজ্জায় নিমজ্জিত করেছে। তবে জানি না তারা নিজেরা নিজেদের আচরণে পরে লজ্জাবোধ করেছেন কিনা। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে কে কতটা ক্ষমতার কেন্দ্রের মানুষগুলোকে প্রভাবিত করতে পারে সেটিই তার বড়ত্বের মাপকাঠি। ভদ্রতা, সভ্যতা, মানবতা, সৌহার্দ্য, সততা ও দক্ষতা যেন কেবল কথার কথা। এটাই আজ আমাদের সমাজের বর্তমান চিত্র। আশ্চর্যজনক হলেও এটা সত্য যে, আমরা মানুষ হিসেবে দায়িত্বশীল হচ্ছি না, এমনকি মরণের এই অদম্য ঢেউ চলাকালেও। ব্যক্তিগত পাওয়া না পাওয়ার উর্ধ্বে উঠার ইচ্ছা বা চেষ্টা কোনোটাই নেই আমাদের করোনাকালীন এই মহা দুর্যোগেও।

তাই আজ আমার প্রিয় "ব্যাবিলন কথকতা"য় আমার অপছন্দের বাস্তব কিছু চিত্র তুলে ধরলাম, যাতে অন্যেরাও তার প্রয়াস পায়। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, করোনা আমাদের কর্মকাণ্ড ও আচরণের ফল। সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আমাদের জন্য সর্তকবার্তা।

অনেকেই বলে এখনকার মানুষ জানতে জানতে জানোয়ার– এ কথার পিছনে কারণ আছে। আমি যে তিনটে ঘটনার উদাহরণ দিলাম তার সবই পরিপূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য। অথচ এটা ঘটছে তথাকথিত শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও স্মার্ট মানুষের দ্বারাই। আজকের দুনিয়া যারা চালায় তাদের অনেকেরই ব্যক্তিগত চরিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আমরা ভীষণ ঝুঁকির মধ্যে আছি সারা বিশ্বজুড়েই। কী ভয়ানক বিকারগ্রস্ত, ক্ষমতালিপ্সু, কৌশলী মানুষজন ও তাদের সহচর কর্মচারীরা সারা বিশ্ব ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত। কাজেই আর মুখ বুজে চেপে থাকার সুযোগ নেই। যা অন্যায়, ভুল, অগ্রহণযোগ্য তা তুলে ধরতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে সংশোধনের কিংবা নিয়ন্ত্রণের। ইতিমধ্যে চার মিলিয়নের মতো মানুষ করোনায় প্রাণ হারিয়েছে, অর্থনীতি আজ স্থবির, লক্ষ কোটি মানুষ বেকার, কোটি কোটি মানুষ অসুস্থ, হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স ক্লান্ত, সর্বশান্ত। কিন্তু তারপরও থেমে নেই দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, নানা ধরনের লোভ-লালসা, দম্ভ ও সত্যকে না মানার অগ্রহণযোগ্য মানসিকতা। এরকম একটি বাস্তব অবস্থায়ও যদি আমরা সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সততা-ধূর্ততা, ভদ্রতা-অভদ্রতা, বিনয়-অহংকারের দোলায় দুলতে থাকি আর স্পষ্ট কথা বলতে না পারি তবে নিজের ন্যূনতম দায় এড়াই কীভাবে?

জয়ীতাদের গল্প

উম্মে সালমা ডালিয়া
অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, প্যাটার্ন
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

পুরুষ থেকে নারীদের গুরুত্বের যে বিভেদ সেটা বোধ করি পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকেই হয়ে আসছে। আমি আগে ভাবতাম, এটা বোধহয় শুধু এই উপমহাদেশেই বেশি। কিন্তু এখন আমি জানি পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেই এই বিভেদটা আছে। শুধু কোথাও কম আর কোথাও বেশি। যখন থেকে বুঝতে শিখেছি তখন থেকেই শুনছি মেয়েরা জোরে হাসবে না, শব্দ করে হাঁটবে না, চিৎ হয়ে শোবে না, মেয়েরা সব জায়গায় যেতে পারবে না। অনেকগুলি 'না' ছিলো শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য। এগুলোর মাঝে বেড়ে উঠতে উঠতে আমার মনে হতো কেন আমি মেয়ে হয়ে জন্মালাম। ছেলেরা অনেক কিছু করতে পারে কিন্তু মেয়েরা পারে না। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা হলে মেয়েদের মতামতের গুরুত্ব দেয়া হতো না। এসব কারণে হোক আর অনেকগুলো ভাইয়ের পরে জন্মানোর কারণেই হোক আমি সবসময় ভাইয়াদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতাম। যেমন তারা কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, কী খেলা ভালোবাসে, পৃথিবীর কোথায় কী হচ্ছে সব জানার চেষ্টা করতাম। আমি অনেক প্রশ্ন করতাম, যেমন USA, UK, NATO, OIC এর ফুল ফর্ম জানতাম খুব ছোটবেলায়। বিভিন্ন দেশের রাজধানী, ওই দেশের সরকার প্রধানের নাম, ইত্যাদি আমার জানা ছিলো। আপনারা হয়তো ভাবছেন এ আবার এমন কী, কিন্তু বিশ্বাস করেন, ঐ সময় আমাদের বয়সীরা এসব জানার কথা ভাবতেও পারতো না। অন্তত আমার চেনা জানার মধ্যে থেকে কেউ ছিলো না। আমি চাইতাম এমনভাবে নিজেকে তৈরি করবো যাতে সব মানুষই আমার সাথে যে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারবে। যেন কেউ আমাকে এমনটা না ভাবে যে, ওতো মেয়ে মানুষ ও আর কী বলবে!

আমার মনে হয় বেশিরভাগ মেয়ের ভিতরে একজন জয়ীতার বসবাস। জয়তা অর্থাৎ জীবনে বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে যেসব নারীরা সামনে এগিয়ে যায় এবং একের পর এক জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করে। আমি আমার মায়ের কথা একটু বলতে চাই। আমার মা যখন খুব ছোট তখন আমার নানি মারা যান। মায়ের কাছে শুনেছি নানির কোনো স্মৃতি ছিলো না মায়ের। আমার মা তার চাচী, বোন এবং ভাবীদের কাছে থেকে মানুষ হয়েছিলেন। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক

শিক্ষা তিনি পাননি। কিন্তু মা তার অদম্য চেষ্টায় স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিতা ছিলেন। আমি দাবি নিয়ে বলতে পারি অনেক উচ্চ শিক্ষিত নারীরও আমার মায়ের মতো শিক্ষা ছিলো না। আমাদের মায়ের শিক্ষা ছিলো ঈর্ষণীয়। মা একাধারে ছিলেন আমাদের সাধারণ শিক্ষার শিক্ষক, ধর্মীয় শিক্ষার শিক্ষক, আদব-কায়দা, ভাষা, নৈতিকতা, রান্নাসহ গৃহস্থালীর শিক্ষক। মা আমাদের উচ্চস্বরে পড়তে বলতেন এবং তিনি রান্না ঘরে বসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের পড়ার ভুলগুলো শুধরে দিতেন। সবাইকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হতো, সকালবেলা কোরআন তেলওয়াত বাধ্যতামূলক ছিলো। মজার ব্যাপার কী জানেন, মা সেই সময় আমাদের যেইসব সূরা, আয়াত এবং তাসবিহ শিখিয়েছেন সেগুলো সবই সহীহ ছিলো। এছাড়া মা আমাদের শিখিয়েছেন আদব-কায়দা, যেমন আঙুল উচুঁ করে বা জিহ্বা বের করে খাবার খাওয়া যাবে না, ইত্যাদি। আরও অনেক কিছু যা কিনা আমাদের চলার পথের রাস্তাটাকে মসৃণ করে দিয়েছে। মা আমাদের মানবিক হতে শিখিয়েছেন। মানবিকতার একটি উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন। ছোটবেলায় আমি দেখেছি মা দুটো শাড়ি পড়তেন। যদি এর মধ্যে একটা পুরোনো হতো, তবেই আব্বা মায়ের জন্য আর একটা নতুন কাপড় কিনে দিতে পারতেন। আর মা তার পুরোনো কাপড়টা কোন গরিব মহিলাদের দিয়ে দিতেন। আমি অনেক রাগ করতাম এই ভেবে যে, বৃষ্টির দিনে কাপড় শুকায় না। তখন মাকে ভেজা কাপড়-ই পরতে হতো। এই সময় যদি পুরোনোটা থাকতো তাহলে সেটা মা পরতে পারতো। যাহোক, আমরা এতগুলো ভাইবোন সবাইকে তিনি এক রশি দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। সবাইকে মানুষের মতো মানুষ হিসেবে তৈরি হতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, মা আজ আর আমাদের মাঝে নেই। সরকারিভাবে অনেক মাকে রত্নগর্ভা হিসাবে সম্মানিত করে সন্তানদের সফলভাবে মানুষ করার জন্য। কিন্তু আজ মা বেঁচে থাকলে আমি নিজেই মাকে সোনার মেডেল বানিয়ে দিতাম। দুর্ভাগ্য আমার এই দুঃখ কোনোদিন শেষ হবে না। তাইতো আমি প্রতিদিন আব্বা/ মার জন্য দোয়া করি যেন উনারা ভালো থাকেন অন্য জগতে। আমার মতে আমার মাও একজন জয়ীতা।

আরেকজন জয়ীতার গল্প বলি, উনার নাম পারুল। দেখতে ভালো এবং বাবা মায়ের প্রথম সন্তান হওয়ায় উনার অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের সময় উনার স্বামীর অবস্থা স্বচ্ছল ছিলো। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই তিন সন্তানের জন্ম হয় পারুলের। এরই মধ্যে দেশে শুরু হয়ে গিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এবং অনেক মূল্যবান প্রাণ ও ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন ভুখণ্ড। বড়দের কাছে শুনেছি সে সময় আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিলো খুবই নাজুক। অনেকের কাছেই অস্ত্র/ বোমা ইত্যাদি ছিলো। এই অস্ত্র অনেকেই ভিন্ন মতাদর্শীদের উপর ব্যবহার করতো। পারুলের স্বামীর কাপড়ের দোকান ছিলো। একদিন দোকানের পাশে একটা বোমা বিস্ফোরণে তার স্বামীর মাথায় ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বোমার স্প্রিন্টার ঢুকে যায়। এই দুর্ঘটনায় উনি প্রাণে বেঁচে যান, কিন্তু যতদিন বেঁচে ছিলেন আর কোনো কাজ করতে পারেনি। উনার কর্মহীনতা এবং চিকিৎসার কারণে এই পরিবার সর্বশান্ত হয়ে যায়। এরই মাঝে তাদের আরও

তিনটি সন্তানের জন্ম হয়। আটজনের এক বিরাট পরিবারের দ্বায়িত্ব একা পারুলের উপর এসে পড়ে। অনেক কষ্ট করে তিনি সন্তানদের খাবার যোগাড় করতেন। বাজার থেকে কাটপিস কাপড় এনে ছোট বাচ্চাদের জামা বানাতেন এবং এই জামা তার দশ বছরের ছেলের মাথায় দিয়ে বাজারে বিক্রি করতে পাঠাতেন। সেলাই মেশিনটাও পারুলের ছিলো না, অন্য লোকের ছিলো। এটাও এক পর্যায়ে ফেরৎ নিয়ে যায় তারা। এমনও অনেকদিন গেছে তারা শুকনা নিমপাতা গুড়ো করে পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে ভর্তা করে ভাত খেতেন। এরপর পারুল একটা ছোট চাকুরি পান। তাতে করে একটু উন্নতি হয় পারুলের অবস্থার। উনার বড় ছেলে নাবালক অবস্থাতেই মায়ের পাশে থেকে সংসারে খরচ যোগানোর চেষ্টা করেছে। কখনও ওয়ার্কশপে, কখনও কারখানায় কাজ করেছে, কোন কাজ করতে পিছপা হয়নি। ভালো পরিবারের সন্তান হয়েও অনেক ছোট কাজ করেছে। অনেক আপনজনের মন্দ কথা শুনেছে কিন্তু হাল ছাড়েনি। এই মা আর ছেলে মিলে বোনদের বিয়ে দিয়েছে, ছোট ভাইটাকে লেখাপড়া করিয়েছে। কিন্তু এই জয়ীতা যখনি সুখের সন্ধান পেতে যাচ্ছিলেন তখনই আল্লাহ তাকে ডেকে নিয়েছেন। দুনিয়াতে উনি আর সুখ পেলেন না। হয়তো এটাই আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। উনার স্বামী অনেক আগেই চলে গিয়েছিলেন এই পৃথিবী ছেড়ে।

এবার আরও একজন জয়ীতার গল্প বলি। এ হচ্ছে আলেয়া, সে যখন খুব ছোট তখন তার বাবা নিখোঁজ হয়ে যায়। আর কখনও ফিরে আসেনি। আলেয়া আজও জানে না তার বাবা আদৌ বেঁচে আছেন না মারা গেছেন। ওরা দুই ভাই বোন, মা লোকের বাসায় কাজ করে তাদের সংসার চালাতেন। এর মাঝেও ছেলেটাকে আরবি শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তার মা। কিন্তু আলেয়াকে তিনি পড়াতে পারেননি শুধু আরবি শিক্ষা দিয়েছেন ঘরে বসে। এক পর্যায়ে উনি নাবালক বাচ্চা দু'টোকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। নিজে লোকের বাসায় কাজ করে ছেলেটার পড়াটা চালু রাখেন আর মেয়েটাকে গার্মেন্টস এ ঢুকিয়ে দেন। গার্মেন্টস এ কাজ করার এক পর্যায় অফিসে আসা যাওয়ার পথে কিছু বখাটে ছেলেরা আলেয়াকে ডিস্টার্ব করতো। একদিন অফিস থেকে ফেরার পথে আলেয়াকে ওদেরই একজন উঠিয়ে নিয়ে যায়। এলাকার গণ্যমান্যদের হস্তক্ষেপে আলেয়াকে উদ্ধার করা হলেও আলেয়া আর ফিরে আসে না। ও মনে করে যে, বদনাম তো হয়েই গেছে তাই ও সেই অপহরণকারিকেই বিয়ে করে ফেলে। আলেয়া চেষ্টা করতে থাকে ছেলেটাকে ভালো পথে আনার। কিন্তু ছেলেটা এরপর আরও একটা বিয়ে করে ফেলে আলেয়াকে রেখে। এরপরও আলেয়া ওকে ছেড়ে চলে যায়নি। কিছুদিন পর ছেলেটার অকর্মণ্যতা দেখে নতুন বউ স্বামীকে রেখে চলে যায়। এরপর ওর স্বামী বিদেশ যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। আর বিদেশে যাওয়ার টাকা যোগাড় আলেয়াকেই করতে হয়। বিদেশে যেয়ে ওর স্বামী আবারও একজন নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। বিদেশ থেকে কোনো টাকা পাঠাতো না আলেয়াকে। উপরন্ত আলেয়াকে তার শাশুরির ভারও বহন করতে হতো। একদিন সর্বশান্ত অবস্থায় ওর স্বামী দেশে ফিরে আসে। আস্তে আস্তে ভালো ব্যবহার এবং ভালোবাসা দিয়ে বখাটে

ছেলেটাকে একটা ভালো মানুষে পরিণত করে আলেয়া। এরপর থেকে ওরা দুজনেই গার্মেন্টস এ কাজ করে, এখন ওরা অনেক সুখি দম্পতি।

আসলে মেয়েরা যদি একটু ত্যাগ স্বীকার করতে পারে আর সঙ্গী যদি সহযোগিতা করে তবেই সংসার সুখের হয়। তবে কি জানেন! প্রতিটি ঘরেই এরকম অজস্র গল্প আছে, যা দিয়ে সিনেমা বানালে সুপার ডুপার হিট হয়ে যাবে। কিন্তু এগুলো বেশিরভাগ মানুষই কারো সঙ্গে শেয়ার করে না। আমার তো মনে হয় আমার জীবনটাই সবচেয়ে বেশি উচুঁ নিচু বাঁকে ভরা। কিন্তু আমি জানি এর থেকেও আনেকের জীবন আরও অনেক কঠিন বাঁকে ভরা। আল্লাহ বলেছেন আমাদের দুনিয়ার জীবনের পুরোটাই হচ্ছে পরীক্ষা। কিন্তু এই পরীক্ষা স্কুল কলেজের পরীক্ষার মতো সবার জন্য একরকম প্রশ্ন নয়। একেক জনের জন্য আলাদা আলাদা পরীক্ষা। খুব ছোটবেলায় আমার বিয়ে হয়ে যায়। তখন আমি সবে ১৫ বছরের কিশোরি। সবসময় ভাবতাম কীভাবে একটু সচ্ছল হবো আমরা, কারণ আমার হাসব্যান্ড ছিলেন এক বৃহৎ পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। একসময় প্রচুর মন খারাপ হতো। কিন্তু কখনও এসব নিয়ে সংসারে অশান্তি করতাম না। ভাইয়াদের অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন জায়গায় চাকরির জন্য আবেদন করি। কতগুলো চাকরির পরীক্ষাও দিয়েছি। কিন্তু চাকরি হয়নি, ঘরে বসে আড়ং এর পাঞ্জাবিতে সুঁই সুতা দিয়ে নকশি সেলাই করেছি, সোয়েটারে নকশি তুলেছি সংসারের বাড়তি উপার্জনের আশায়। সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের ছয় মাসের সেলাই কোর্স করেছি, টাইপ শিখেছি, কিন্তু এতে করে সংসারে তেমন একটা অবদান রাখতে পারিনি। এরই ফাঁকে ব্যাবিলনে জয়েন করার জন্য ডাক পাই। এর পাঁচ বছর আগে অবশ্য এক বছর ট্রেনিংসহ চাকুরি করে গেছি। তখনকার গার্মেন্টস এর অবস্থা এখনকার মতো এতো ভালো ছিলো না। তাই প্রথমে আমি গার্মেন্টস এ আসতে চাইনি। কিন্তু ছোট ভাইয়ার অনুপ্রেরণা এবং সালাম স্যারের অনুরোধে আমি আবার জয়েন করেছি। এখানে এসেও সব সময় কাঁটা সরিয়ে এগুতে হয়েছে। মেয়ে বলে পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়েছি। এমনও বলা হয়েছে মেয়েরা টেকনিক্যাল কাজ করতে পারবে না। সবার সামনে এগুলো বলে আমাকে অপমান করা হতো। এমনকি বায়ারদের প্রতিনিধিদেরকেও বলা হতো। কী যে খারাপ লাগতো তখন। তবে ঐসব সমালোচনাই আমাকে সামনে এগুতে ভীষণরকম সাহায্য করেছে। একেক সময় একেক রকম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছি। আর এই করতে করতে আল্লাহর অশেষ রহমতে কুড়িটা বছর পার করতে চলেছি ।

আমার মায়ের খুব ইচ্ছা ছিলো আমি যেন মাস্টার্সটা কমপ্লিট করতে পারি। তাই এই সময়ে এসে সেটাও পাস করে ফেলেছি। এই পরীক্ষায় পাসের ব্যাপারটাও সহজ ছিলো না আমার জন্য। আমাদের সময় ডিগ্রি দু'বছরের কোর্স ছিলো কিন্তু এখন তিন বছর করেছে। তাই আমাকে তৃতীয় বছরের পরীক্ষায় পাস করতে হয়েছে মাস্টার্স পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। এই পরীক্ষার গল্পটাও বেশ টান টান উত্তেজনায় পূর্ণ ছিলো। একই সাবজেক্ট এর চার পার্ট পরীক্ষা। আমার সাবজেক্ট ইসলামের ইতিহাস, ২য় পত্র পরীক্ষার দিনে পরীক্ষা হলে গিয়ে

দেখি হল পরিবর্তন হয়ে গেছে, আমি আমার সিট খুঁজে পাচ্ছি না। একজন পরীক্ষার্থী বললেন, যে কোনো এক সিটে বসে পড়েন। আমি ইতস্তত করছিলাম। এদিকে সময় ও শেষ হয়ে যাচ্ছে তাই পেছনের দিকে একটা সিটে বসলাম। খাতা দেওয়া হলে প্রয়োজনীয় সব তথ্য খাতায় লিখলাম। এরপর দুজন পরীক্ষক এসে প্রশ্ন দিতে লাগলেন, একই দিনে ইতিহাস এবং ইসলামের ইতিহাস পরীক্ষা হচ্ছিলো। ম্যাম আমাদের প্রশ্ন দিলেন, আমি প্রশ্ন পেয়ে খুবই হতাশ হলাম। মাত্র দুইটা কমন পড়েছে। যাহোক, দুইটার পূর্ণ উত্তর লিখলাম আর বাকিগুলো শুধু ভূমিকা লিখলাম। কিন্তু গোল বাঁধলো শেষের ঘণ্টায়, ম্যাম আমার নাম ধরে ডাকছেন, আমি উঠে দাঁড়ালাম উনি যা বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে আমি ইসলামের ইতিহাসের বদলে সাধারণ ইতিহাসের প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা দিয়েছি। তখন হাতে আর মাত্র বিশ মিনিট সময় ছিলো। মনের কষ্টে খাতা জমা দিয়ে সঠিক প্রশ্নটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। প্রশ্নপত্রের প্রায় সবগুলোই আমার কমন ছিলো। পরের দুইটা পরীক্ষা বেশ ভালো হয়েছিলো। আমি ভেবেছিলাম আমার ফেল আসবে কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে গড়ে পাস করে গিয়েছিলাম। মাস্টার্স ১ম পর্বের ফরম ফিলাপ করেও প্রথমবার পরীক্ষার তারিখ না জানার কারণে পরীক্ষা দিতে পারিনি। তার পরের বছর আল্লাহ আমাকে পরীক্ষা দেবার তৌফিক দান করেছেন। আরও অনেক বাঁধা ছিলো। অফিস কামাই না করে পরীক্ষাগুলো দিয়েছি। আধাবেলা পরীক্ষা দিয়েছি আধাবেলা অফিস করেছি। যাহোক, আমি মনে করি যদি কেউ মন থেকে কিছু করতে চায় তাহলে তাকে আল্লাহ সাহায্য করেন। এত কিছুর পরেও সংসারের সব দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি। আমরা মেয়েরা চাইলে আসলে সব করতে পারি। শুধু অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তাহলেই সব জায়গায় সফল হওয়া যায়। তাই আমার মনে হয় পৃথিবীর সব মেয়েরাই একেক জন জয়ীতা।

ষোড়শী কথকতা

সাইদুর রহমান
সিনিয়র অফিসার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন প্রিন্টার্স লিমিটেড

জন্ম তোমার হয়েছে যে এক
বুনিয়াদি সাদা ঘরে,
প্রেম-প্রীতি আর ভালোবাসার যত
মানুষের হাত ধরে।

তোমাকে দিয়েছে জন্ম যারা
হয়তোবা আজ দূরে,
তোমার অস্তিত্বে রেখেছো তুমি
তাঁদের আপন করে।

তাঁদের তুমি, তুমি তাঁদের
এই ধ্যান-জ্ঞান করে,
তোমার তুমি বেড়ে উঠেছো
তিল তিল করে করে।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ক্রমে
চতুর্দশ পার করে,
সন্ধিক্ষণের ধাক্কায় পড়লে
পঞ্চদশের ঘরে।

কাটিয়ে উঠলে করোনাসন্ধি
ঝেড়ে সব মলিনতা,
সমুখে তোমার সুন্দরী রূপ
ষোড়শী কথকতা।

পুষ্পকথা

মো. সোহেল রানা
সিনিয়র সুপারভাইজার, ফিনিশিং
ব্যাবিলন প্রিন্টার্স লিমিটেড

গোলাপকে প্রশ্ন করিলাম আমি
ওহে গোলাপ
ফুলে আছে কাঁটা
তাতে মনে লাগে ব্যথা
গোলাপ বলিল আমায়
আমার কাঁটার আঘাতে যে রক্ত ঝরে
তাতে ভালোবাসার বিষ ঝরিয়া পরে।

গাঁদাকে প্রশ্ন করিলাম আমি
ওহে গাঁদা
তোমার গন্ধে আমি
হই নাতো আকুল
তবে কি তোমার আছে কোনো কূল
গাঁদা বলিল আমায়
শোনো বলি
আমার গন্ধে তুমি না হও যদি আকুল
তবে গলায় পরিয়া তোমার
হই আমি কূল।

প্রশ্ন করিলাম আমি
ওহে হাসনাহেনা
তোমার গন্ধ বিলাইতে গিয়া
রাতে ঝরিয়া পড়ো
তাতে আমাদের কি উপকারে আসতে পারো?
আমায় কহিল হাসনাহেনা
রাতের বাতাসে গন্ধ ছড়ায়া আমি
তোমার নিদ্রায় আনি সুখ
তাতে দূর হয় অনেক অসুখ।

প্রশ্ন করিলাম আমি পদ্মরে গিয়া
আছে তোমার কি কোনো কাজ?
পদ্ম কহিল আমায়
আমি হইয়া পদ্মবতী
পুজোর ঘরে হই শোভা প্রতি।

প্রশ্ন করিলাম আমি
শিউলিরে গিয়া
শোভাহীন হইয়া
গাছের নিচে থাক পড়িয়া
শিউলি কহিল আমায়
আমার ফুলের মালা গাঁথিয়া
তোমার বধূর খোঁপায় শোভা বাড়াও।

তুমি

মো. সাইদুর রহমান
জুনিয়র অফিসার, স্টোর
অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড

সুরের ব্যঞ্জনায় তুমি পাখির কলরবে।
আকাশ-বাতাস পাহাড়-পর্বত আছে যত সবে।
তুমি আমার বেসুরাসুর কণ্ঠে অনবদ্য,
আছো মিশে বেহালার তালে নাটকে সদ্য।
তুমি আমার ব্যস্ততায় কর্ম, অলসতায় আলসেমি
আমি সবখানে পাই যেন তোমার পদধ্বনি।
তুমি আমার পাশ্চাত্যের হেলেন, প্রাচ্যের সীতা
হৃদয়ে তোল ঢেউ লহরী অনিন্দিতা।
আমার মৌন হিমালয় গভীর প্রশান্ত
উদার আকাশ তোমাতে করে বাস।
তোমাকে নিয়ে হৃদয়ে সঞ্চালিত যত ছন্দ
লিখে যাই রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দ।
শরতের শিউলি তুমি শীতের নকশীকাঁথা
বর্ষার কদম্ব তুমি, গ্রীষ্মের কৃষ্ণচূড়া
হেমন্তের কৃষাণির হাসি তুমি
বসন্তের মৃদু হাওয়া।

বাস্তবতা

ডা. মো. দিদারুল করিম
মেডিকেল অফিসার
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

জনবহুল দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। জনসংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠছে হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ক্লিনিকগুলি। সেই সাথে ব্যাঙের ছাতার মতো বাড়ছে ঔষধের দোকানের সংখ্যা। বাড়ির কাছে সহজেই বাকিতে ঔষধ পাওয়া যায়, ডাক্তারের ফি লাগে না– এসব সুবিধার জন্য ফার্মেসির দিকে ঝুঁকছে অনেকেই।

এগুলি কি সুবিধা নাকি অসুবিধা, তা এক জ্বর দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি। জ্বর হলে সাধারণ জনগণ কোথায় যায়? ফার্মেসিতে। ঐ রোগীর কাছে কাঁচের থার্মোমিটারে জ্বর দেখা কঠিন ও দুঃসাধ্য এক ব্যাপার। সামান্য জ্বর হলেও ফার্মেসিওয়ালার চমৎকার উপস্থাপনায় জ্বর ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি চলে যায়। কারণ উচ্চ তাপমাত্রার জ্বরে ঐ রোগীর কাছে অখ্যাত কোম্পানির অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি করতে পারলেই ফার্মেসিওয়ালার লাভ। পরবর্তীতে এই অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার ফলে তার শরীর দুর্বল হলে আয়ুর্বেদিক ভিটামিনের সিরাপ ও অখ্যাত কোম্পানির ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট রোগীকে ধরিয়ে দিয়েই এ যাত্রায় রক্ষা ফার্মেসিওয়ালার। যখন এতেও কাজ হয় না তখন শিরায় স্যালাইনই হয়ে ওঠে একমাত্র ভরসা। মাঝখান থেকে রোগীর সময়, স্বাস্থ্য, অর্থ সবই অপচয়। জ্বরের ঐ রোগীর যাওয়া উচিৎ ছিলো একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের কাছে (যার ন্যূনতম যোগ্যতা এমবিবিএস)। চিকিৎসক প্রাথমিক পর্যায়ে ঔষধ লিখতেন। যদি অবস্থার উন্নতি না হয় তাহলে প্রয়োজনীয় পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে চিকিৎসক প্রয়োজনীয় ঔষধ লিখতেন। এই সেবা পেতে হলে আপনি যেতে পারেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স অথবা সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে। অনেকেই এখানে যেতে চায় না কারণ রোগীরা লম্বা সিরিয়ালের জন্য বিরক্ত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আপনার আর্থিক অবস্থা ভালো হলে আপনি কোন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে গিয়েও সেবা নিতে পারেন। এক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যয়বহুল হলেও আপনার সময় সাশ্রয় হবে। যেখানে সেবা নিন না কেন, সঠিক সেবা ও সুস্থতাই আমাদের একান্ত কামনা। সুস্থ জাতিই সুন্দর একটি দেশ উপহার দিতে পারে, রাখতে পারে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ফার্মেসিওয়ালার মিষ্টি কথায় না ভুলে বাস্তবতায় বিশ্বাস করুন, সুস্থ জীবন গড়ুন।

না ছাড়িব আশা

কাজী এএম তুষার আলম
প্রাক্তন ম্যানেজার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

হ্যালো মারিয়া, ভালো আছো মা?
মোবাইল ফোনের ওপ্রান্ত থেকে উত্তর আসে,
– হ্যাঁ, মা, ভালো আছি। তুমি কেমন আছো?
– আমি ভালোই আছি।
– তুমি ফ্যাক্টরি থেকে বের হইছো, মা?
– হ্যাঁ রে মা, বের হইছি। বাসার দিকে যাচ্ছি। ঘরে অনেক কাজ জমে আছে। সেগুলো রাতেই শেষ করে আবার সকালে ফ্যাক্টরিতে আসতে হবে। সামনে ঈদ তো, অনেক কাজের চাপ। বায়ারের শিপমেন্ট সময়মতো দিতে না পারলে নাকি ফ্যাক্টরির অনেক ক্ষতি হবে। আবার বেতন-বোনাসের বিষয় আছে। সব মিলে সবাই খুব চাপের মধ্যে আছে। আর ঈদের সময় এইরকম চাপ থাকে। তার উপর আবার করোনা অসুখ চলতেছে, সাবধানে থাকা লাগে।

মারিয়া চুপ করে মায়ের কথাগুলো শুনছিলো। মা তাকে নিয়ে অনেক ভাবে। অনেক কষ্ট করে টাকা জমিয়ে তার পড়াশোনার খরচ চালায়। মায়ের স্বপ্ন একদিন সে অনেক বড় অফিসার হবে। মায়ের সেই স্বপ্ন পূরণ করার জন্য মারিয়াও অনেক চেষ্টা করে। মারিয়া সবেমাত্র ক্লাস এইটে পড়ে। তার মা-ও এইট পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। এরপর আর পড়াশোনা করতে পারেনি। তাই সে সবসময় স্বপ্ন দেখে মেয়েকে নিয়ে। বাবাটাও কোনো কিছু না বলে তাদের ফেলে রেখে চলে গেছে। একটুও ভাবলো না আমরা কীভাবে থাকবো, কীভাবে বাঁচবো।

– মারিয়া, শোনা যাচ্ছে মা?
– হ্যাঁ মা, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা মা, তুমি এতো কষ্ট করো কেন?

মেয়ের এই প্রশ্ন শুনেই মনিরা মনে মনে ভাবতে থাকে অনেক কথা। মুখে আর কথা সরে না। ভাবতে ভাবতেই হাঁটতে থাকে। তার কষ্টের যে অন্ত নেই। মনিরা অত্যন্ত একা। একমাত্র মেয়ে ছাড়া তার চোখের পানি মুছে দেবার মতো কেউ নেই। মেয়েকে গ্রামে তার নানির কাছে রেখে এসেছে পড়াশুনা করার জন্য। কতদিন হয়ে গেলো মেয়েটাকে সে দু'চোখ ভরে দেখতেও পারেনি। কেমন আছে মেয়েটি? কী খাচ্ছে? মা ছাড়া মেয়েটি যে কেমন আছে

ভাবতেই তার বুক হুহু করে কেঁদে উঠে। মনিরা ভেবেও কোনো কূল কিনারা খুঁজে পায় না। তবু মন থেকে সাহস সঞ্চয় করে এই পথ পাড়ি দিয়েছে অনেক সময় এবং ভবিষ্যতেও পারবে বলে আশায় বুক বাঁধে। মারিয়ার জন্মের ঠিক পরপরই ওর বাবা তাদের ছেড়ে চলে যায়। ওর বাবা সাথে থাকলে হয়তো এতো কষ্ট হতো না। একসাথে থেকে ডালভাত খেয়ে হয়তো স্বপ্নগুলো পূরণ করা যেতো। সেও ওই গ্রামেই থাকে, টুকটাক কাজ করে কিন্তু তাদের কোনো খবর নেয় না। কী আজব মানুষ একটা, মুনিরা তাকে চিনেই উঠতে পারলো না। মারিয়াকে মানুষের মত মানুষ করার জন্য মনিরা সাহস সঞ্চয় করে। সেই ছোট্ট মেয়েটিকে নিয়ে ঢাকায় এসেছিল জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার জন্য। সে আশা ছাড়েনি। সে নিজেও বাঁচবে এবং মেয়েকে নিয়ে সম্মানের সাথেই বাঁচবে। মনিরা এখন আর ভয় পায় না। তার আয়ের এক এক পয়সা মেয়ের পড়াশুনা, ঘর, বিয়ে ইত্যাদির জন্য সঞ্চয় করে। সবকিছু ঠিক থাকলে তার আরো কষ্ট করতে কোন সমস্যা নেই। মেয়ে ভালো থাকলেই ভালো। হুস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে মনিরা।

– ও মা, শুনতে পারছো?
– হ্যাঁ রে মা, শুনতে পাচ্ছি।
– তাহলে কথা কও না যে!
– তুমিই বল মা, আমি শুনি।
– তাহলে উত্তর দিলে না যে!
– কীসের?
– ওই যে বল্লাম, এতো কষ্ট কর কেন?
– আচ্ছা বাদ দাওতো ওসব কথা। এখন বলো, তুমি খাইছো?
– তুমি খালি এড়িয়ে যাও। কচু ভর্তা, শাক আর ভাত খাইছি।

মনিরার বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে ওঠে। দুচোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে পদ্মার অথৈ জল। দুই নাসিকা রন্ধ্র দিয়ে চলতে থাকে জয়ন্তি নদীর ধারা। বাম হাতের কব্জি দিয়ে কোন রকম চোখের জল মুছতে মুছতে মনিরা বলে,
– এবার বাড়ি আসলে তোমাকে বেতমোড়ার হাট থেকে রাজহাঁস কিনে নিজে রান্না করে খাওয়াবো।
– আমার রাজহাঁসের মাংস লাগবে না। তুমি অত কষ্ট না করে বাড়ি চলে আসো। আমরা মা মেয়ে মিলে কোনোরকম ভালোভাবেই বেঁচে থাকবো।

বার বছরের মেয়েটির মুখে এমন কথা শুনে মনিরা খুব কষ্ট পায়। এতো অল্প বয়সেই মেয়েটি কতোকিছু বুঝতে শিখেছে। মনিরা নিজেও যখন এই বয়সি ছিলো, সেও কি এতো কিছু বুঝতে পারত? নিশ্চয়ই না।
মনিরার গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুর জেলার ডামুড্ডা ইউনিয়নের জয়ন্তী নদীর তীরে। ১৯৮৪

সালে বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ব্রিটিশ বিরোধী তথা ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা হাজী শরিয়তুল্লার নামে শরীয়তপুর জেলার নামকরণ করা হয়। এ জেলার তৎকালীন মাদারীপুর মহকুমার প্রশাসক বিখ্যাত বাংলা কবি নবীন চন্দ্র সেনের আমন্ত্রণে নারী শিক্ষার পথিকৃত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ডামুড্যা ভ্রমণে এসে জয়ন্তী নদীকে দেখে কলকাতার দামোদর নদীর মতো বলে অভিহিত করেন। তাঁর সম্মানেই কবি নবীন চন্দ্র সেন এই জায়গাটির নাম রাখেন দামোদর। ক্রমে ক্রমে এই এলাকাটি ডামুড্যা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বর্তমান ডামুড্যা ইউনিয়নের প্রত্যন্ত গ্রাম গড়োয়া। এই গ্রামেই বেড়ে ওঠা মনিরার। সে অত্যন্ত সুশ্রী ও শান্ত স্বভাবের মেয়ে। তার খুব মনে পড়ে তার প্রিয় গ্রামটির কথা। এখানেই কেটেছে শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনকাল। প্রত্যেকটি নদী, খাল, বিল, গাছ, লতা, পাতা তার অত্যন্ত পরিচিত। গ্রামের মানুষগুলোও তার পরিচিত। তার স্বামীও একই গ্রামের, তাহলে ফেলে রেখে চলে গেলো কেন? কৈশোর না পেরুতেই বিয়ে হয় তার। হৃদয়ে অনেক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে শুরু করেছিল স্বামীর সংসার। বছর পার হতেই কোল জুড়ে আসে মারিয়া। তখন তার আনন্দের কমতি ছিলো না। কিন্তু কোনো কিছু বোঝার আগেই মারিয়ার বাবা তাদের পরিত্যাগ করে। ভাগ্য অন্বেষণে মনিরা পাড়ি জমায় ঢাকা শহরে। আজ জীবিকার প্রয়োজনে গ্রামের খোলা মাঠ ছেড়ে দশ ফুট বাই দশ ফুট ঘরে বন্দি। ভাগ্য পরিবর্তনে হয়ে উঠেছে দক্ষ গার্মেন্টস কর্মী। সেলাই মেশিনে বসলেই স্বপ্নের গতিতে চলে মেশিন। মনিরার বিশ্বাস এই মেশিন তার ভাগ্য পরিবর্তন করবে এবং তার ফলও সে পাচ্ছিলো। ছোট্ট গ্রাম জনপদের মনিরা ঢাকা শহরের খুব বেশি চেনে না। গার্মেন্টস-এর কয়েকজন সহকর্মী ছাড়া তার আর পরিচিত কেউ এখানে নেই। ফ্যাক্টরি ও বাসা এই হলো তার পদচারণা। মারিয়া এখন এইটে পড়ে। এরপর এইট থেকে নাইন, টেন, গ্রাজুয়েশন এই নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন। কম টাকায় ঝালমুড়ি কিনতে গেলেও মনিরার কষ্ট হয়, জমিয়ে রাখে মেয়ের জন্য। নিজে ক্লাস এইট-এর পর পড়াশুনা করতে পারেনি তাই মেয়েকে নিয়ে স্বপ্নে তার দুচোখ জ্বলজ্বল করে। ভাবে, সুদিন আসবে।

– ওমা, কী হইলো তোমার? কথা কও না কেন?
– নারে মা, ভাবি তোর কথা।
– আমার কথা অতো ভাবার দরকার নেই। তাড়াতাড়ি বাসায় যাও, কাজকর্ম করে শুয়ে পড়ো। আমার পড়া আছে। এমনিতে এই মহামারী করোনার সময় স্কুল বন্ধ থাকাতে সব ভুলে যাচ্ছি। নিজে নিজে যতটুকু পারি আগায় রাখতেছি। তুমি কোনো চিন্তা করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

২০২০ সালের ৮ই মার্চ বাংলাদেশে প্রথম তিন জন করোনা রোগীকে শনাক্ত করে আইইডিসিআর। এর পরে বাংলাদেশ সরকার ২৩ মার্চ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত লকডাউন ঘোষণা করে। তারপর বিভিন্ন মেয়াদে ২০২১ সাল পর্যন্ত অবস্থার কোনো উন্নতি ঘটছে না। স্কুল কলেজ তো বন্ধই, অনেক গার্মেন্টসও বন্ধ হয়ে গেছে। ২০২০-এর

লকডাউনে মনিরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। সবকিছুতো ভালোই চলছিলো, তাহলে কী এমন হলো? মনিরা কীভাবে চলবে, মেয়ের পড়াশুনা কীভাবে চলবে। সে দুই চোখে পুরো অন্ধকার দেখছিলো। এরপর সে আরো আহত হলো যখন সে শুনলো, যে গার্মেন্টস-এ সে কাজ করতো, সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। আয় নেই, কিন্তু সব কিছু বন্ধ থাকার কারণে ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। এমনিতে তার আর্থিক অবস্থা ভালো না, তার উপর এই করোনার কারণে নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কোথাও কোনো লোক নিয়োগ হচ্ছিল না। দু'চোখে শুধুই অন্ধকার দেখছিলো সে। আর্থিকভাবে ব্যাপক ধ্বসে পড়ছিলো। সরকার ও মানবতাবাদী কিছু সংগঠনের সাহায্যে চলছিলো মনিরার সংসার। কোনোরকম একটা সুযোগ করে একটা ফ্যাক্টরিতে চাকরি পেলো মনিরা। হাঁপ ছেড়ে উপরওয়ালার কাছে অনেক শুকরিয়া জানালো। আহ! বলে শান্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো মনিরা। গামেন্টস-এর অর্ডার, বায়ার, শিপমেন্ট সবকিছু নিয়ে অনেক ব্যস্ত মনিরা। একমাস পরেই ২০২১ সালের কোরবানি ঈদ, তার উপর লকডাউনের কারণে জিনিসপত্রের দাম ও যাতায়াত খরচ বেড়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কারণে সব যানবাহন সীমিত পরিসরে খোলা, বন্ধ চলছে। যাইহোক, একমাস পরে ঈদ। তখন যাবে মেয়ের সাথে দেখা করতে। মনিরা ভাবে আর মুচকি হাসে। পুরো করোনাকালীন সময়ে মনিরার সব হিসাব যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। কী হবে শেষ অব্দি কে জানে! তারপরেও আশায় বুক বাঁধে, সুদিন আসবে। মনিরা চোখ দুটি বন্ধ করে মেয়েকে বললো-

– মারিয়া, এই ঈদে তোর জন্য কী কিনবো জানিস? সুন্দর একটা জামা ও বোরকা কিনে দিবো।

- আমার কিছু লাগবে না মা, তুমি ভালোয় ভালোয় বাড়ি আসো। এইতো আর একটা মাস, দেখতে দেখতেই চলে যাবে। তুমি বাড়ি আসলে একসাথে ঈদ করবো। অনেকদিন দেখা হয় না, মা তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করতেছে।

– আমারও মা, খুব দেখতে ইচ্ছে করতেছে।

– মা, ঈদের সময় লকডাউন থাকলে তুমি আর কষ্ট করে আসবা না। গত রোজার ঈদে রাস্তাঘাটে অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে। লকডাউন খুললে তুমি আসবা নতুবা ঈদের পরে আমি আর নানি ঢাকায় আসবো। ঠিক আছে মা? বুঝেছ?

– বুঝেছি মা, তাই হবে।

– ঠিক আছে, তাহলে ফোন রাখো। রাত হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বাসায় যাও।

এই বলে মনিরা ফোনটা রেখে দেয় কিন্তু মনিরার মনটা মানে না। কতদিন দেখা হয় না!

মনিরা ফোনটা রেখেই দেখলো রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে। হাইওয়ে রাস্তা দিয়ে সাঁই সাঁই করে ছুটে চলা গাড়িগুলোর বিভিন্ন রঙের আলো দেখে মনিরার ভালো লাগে। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের নিয়ন আলো তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কত ধরনের রঙ চারিদিকে। কত রঙিন এই পৃথিবী। তবুও কেন এই পৃথিবী তার বুকে আগলে রাখা কিছু কিছু মানুষকে এতো কষ্ট দেয়। পৃথিবীর ভালোবাসা ও নির্মমতা মনিরা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। সে নিজেও এই সাদাকালো পৃথিবী থেকে বেরিয়ে রঙিন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে। মেয়েটাই যে তার

সব। মেয়েটিকে মানুষের মতো মানুষ করার জন্য সে আর কোনো বিয়ে থা করেনি। নিজের অসহায়ত্বকে বার বার শক্তি রূপে ফিরিয়ে এনেছে। মানবে না হার, ছাড়বে না আশা। এক নজর নিয়ন আলোর দিকে তাকালো মনিরা। মনে পড়লো এই নিয়ন আলোর তলে খুঁজে পেয়েছিলো হারানো মারিয়াকে। মারিয়ার তখন আড়াই বছর বয়স। কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। পাগলপ্রায় মনিরা সারা এলাকা তন্ন তন্ন করে মারিয়াকে খুঁজে পায় এই নিয়ন আলোর তলে। এরপর আর নিজের কাছে না রেখে পাঠিয়ে দেয় তার নানির কাছে– একই গ্রামে যেখানে মনিরার স্বপ্নগুলো বুনে রাখা সযতনে। সাধ্য আর সামর্থ্যের মধ্যে খুব আদর যত্ন করে গড়ে তোলা মারিয়ার জীবনটা। হাতে বেতন পেয়েই পাঠিয়ে দিয়েছে মেয়ের খরচ। মোটামুটি সবকিছু ঠিকভাবেই চলছে। ঠোঁটের কোণে পরিতৃপ্তির হাসিটা নিয়েই মনিরা রাস্তা পার হতে লাগলো।

হঠাৎ একটি আর্তনাদ। সাঁই সাঁই করে ছুটে আসা গাড়িগুলো সব থেমে যাচ্ছে। চারিদিকে শুধু হায় হায় রব। কেউ কেউ বলছে, কী হলো, কী হলো? গাড়ির রঙিন আলোগুলো একে একে নিভে যাচ্ছে। ল্যাম্পপোস্টের নিয়ন আলোটা ভালো দেখা যাচ্ছে না। লোকজন ছুটাছুটি করছে সাহায্যের জন্য। মনিরা বুঝে উঠতে পারছে না কী হয়েছে। চোখে অন্ধকার দেখছে। নিজের শরীর তুলতে পারছে না। সাহায্যের জন্য বাড়ানো হাতগুলিকে চিনতে পারছে না। সবগুলি অচেনা মুখ তাকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করছে।

মনিরা ভাবছে– 'কী হয়েছে আমার? নিশ্বাস নিতে পারছি না কেন? অনেক শব্দ হচ্ছে কিন্তু কোনটা কীসের শব্দ কেন বুঝতে পারছি না? আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? আমি হাওয়ায় ভাসছি কেন? আমার মেয়েটা কোথায় আছে? হায় হায় মারিয়ার কী হবে আমি না থাকলে? খুব মনে পড়ছে মেয়েটির কথা। কে তোমরা? কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমাকে? আমাকে পৃথিবীতে থাকতে দাও। আমাকে এখনই নিয়ে যেও না। মা-বাবা ভাইয়ের কথাও খুব মনে পড়ছে। আমি না থাকলেও নিশ্চয় তারা মারিয়ার ঠিকমতো খেয়াল রাখবে! কিন্তু এতিম বলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হবে সেটা কীভাবে পূরণ করবে? ও যে এখনও অনেক ছোট। এতো ছোট্ট বয়সে কেন তাকে এতো কষ্ট পেতে হবে? স্বামীর কথাও খুব মনে পড়ছে। কতই না প্রেম ছিলো তার সাথে। কতই না রাগ-অভিমান-দুঃখ-ভালোবাসার কথা তার সাথে বলা হলো না। ছোট্ট মেয়েটা ধীরে ধীরে বড় হয়ে যাচ্ছে। স্বামীকে বোঝাবে ফিরে আসার জন্য। সে আমাদের ছেড়ে চলে না গেলে আজকে হয়তো এই অবস্থায় পড়তে হতো না। কোনোরকম ভাতে ভর্তা খেয়ে জীবনটা ভালোই চলে যেত। অন্তত একবার চোখের জল মুছে দিয়ে বলতো– "ভেবো না মনিরা, আমি আছি।" তার সাথেও কি আর দেখা হলো না! অনেক জিজ্ঞাসা ছিলো তার কাছে, সেটিও অপূর্ণ থাকবে! কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এরা আমাকে? আমি এত অভাগী কেন? এমন কেন হলো? আমি তো আশা ছাড়িনি, তবে জীবন কেন আমার আশা ছেড়ে দিলো...'

নবীন প্রেমিক ওই বসিয়া বিরলে,
না পেয়ে প্রিয়ার পত্রে তব দরশন,
নিরাশ প্রণয়ে ভাসে নয়নের জলে,
ভঙ্গ-প্রায় অভাগার প্রণয়-স্বপন।
শুনিয়া তোমার মৃদু সুমধুর ভাষা,
বলিল নিশ্বাস ছাড়ি– "না ছাড়িব আশা"

–কবি নবীনচন্দ্র সেন।

ক্লেপটোমেনিয়া

রুমানা আক্তার
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, হিউম্যান রিসোর্সেস
ব্যাবিলন গ্রুপ

২০০১ সাল। মিতু তখন রাজধানীর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছে। ছোটবেলা থেকে জেলা শহরে বেড়ে ওঠা মিতু তখনও জানে না রঙিন শহর ঢাকা তার জন্য কী কী চমক নিয়ে অপেক্ষা করছে। এতদিনের চেনা গণ্ডি ছেড়ে, স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশে ঢাকায় আসাটা মিতুর জন্যে ছিল স্বনির্ভরতার প্রথম পদক্ষেপ আর ওর বাবার জন্যে সেটা ছিল 'এক দুঃসাহসিক অভিযান।'

যাহোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হবার দুদিন আগে ঢাকায় থাকবার জন্য মিতু তার চাচার বাসায় উঠেছে। কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে তখনও সিট পাওয়া যায়নি, আর হলে সিট পাওয়া নাকি 'অত সহজ না।' এভাবে কয়েক মাস যাবার পরে অনেক চেষ্টা-তদবিরের মাধ্যমে অবশেষে মিতু হলে সিট পেলো।

প্রথমবারের মতো হলের কক্ষে ঢুকেই মিতুর বড্ড মন খারাপ হয়ে গেলো। সে ভাবলো- 'এত ছোট একটা রুমে এতগুলো মানুষ কীভাবে থাকে?' ঢাকায় আসবার পরে এই প্রথম মিতুর বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করলো। তবে সে এতো সহজেই হার মানবার পাত্রী নয়। অতদূর থেকে শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য সে ঢাকায় এসেছে। ডিগ্রী সে শেষ করেই ফিরবে, যে করেই হোক। 'রুমে আর কতক্ষণই বা থাকবো' ভেবে মিতু ব্যাগটা রেখে হলে থাকা ওর অন্যান্য সহপাঠীদের সাথে দেখা করতে গেলো। রাতে রুমে ফিরে রুমমেটদের সাথে আলাপ হলো মিতুর। দেখা গেলো সবাই ওর বয়সে বড় এবং ভিন্ন অনুষদের। ওদের সাথে কথা বলে মিতু আরো জানতে পারলো রুমের ছোট্ট সদস্য হিসেবে তাকে দ্বিতীয় বর্ষের এক আপুর সাথে ডাবল বেড শেয়ার করতে হবে। তবে আশার কথা হলো সেই আপুর বাসা ঢাকাতেই, সে শুধু পরীক্ষার সময়ে হলে থাকে।

সোমা আপুর সাথে (যে আপুর সাথে মিতুকে শেয়ার করতে হবে, তার ছদ্মনাম) মিতুর প্রথম দেখা হলো প্রায় মাসখানেক পরে। সকাল থেকে দুপুর অব্দি একটানা ক্লাস করে সেদিন ভীষণ ক্লান্ত লাগছিলো মিতুর। সে ভেবেছিলো রুমে গিয়ে ফ্রেস হয়ে একটা লম্বা ঘুম দেবে। কিন্তু রুমে

গিয়ে মিতু দেখলো সোমা আপু এসেছে, তার সামনে পরীক্ষা তাই আগামী কয়েকমাস সে হলেই থাকবে।

পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আছে, যাদের সাথে প্রথম আলাপেই মনে হয় যেন সে অনেকদিনের চেনা। মিতুর মনে হলো সোমা আপু ঠিক তেমনই একজন মানুষ। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় সোমা আপুর সাথে তার ভাব হয়ে গেলো। সোমা আপু সম্পর্কে তার মনে এতদিন যেসব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-শঙ্কা কাজ করছিলো (হলের অন্যান্য বান্ধবিদের বড় আপুদের সাথে থাকার অভিজ্ঞতার আলোকে) তা যেন এক মুহূর্তেই গায়েব হয়ে গেলো, তার বদলে জায়গা করে নিলো এক গভীর শ্রদ্ধাবোধ। কীভাবে? বলছি...

মিতু বরাবরই মানুষের প্রখর ব্যক্তিত্ব ও উচ্চ বুদ্ধিমত্তার প্রতি দুর্বল। সেদিক থেকে সোমা আপু দশে নয় পাবার মতো। তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যাবে না, তবে তার জ্ঞানের পরিধি নিয়ে কিছু বলা যায়। যেই সময়টার কথা বলছি সেই সময়ে ইন্টারনেট এতটা সহজলভ্য ছিলো না। সাইবার ক্যাফেগুলোতে যে দামে ইন্টারনেট বিক্রি হতো তা অনেকের পক্ষেই বহন করা সম্ভব হতো না। আর ইন্টারনেট স্পিডের কথা নাই বা বললাম! মিতু যেবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে সেবার থেকেই সেমিস্টার সিস্টেম চালু হয়েছে, আর সেই সাথে যোগ হয়েছে নতুন নতুন বিষয়। যেগুলোর কোনো বই, সেমিনারে তো বটেই, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারেও নেই। স্বাভাবিকভাবেই মিতুর তখন দিশেহারা অবস্থা। যদিও কিছু বই বিভাগীয় শিক্ষকের কাছে পাওয়া যেতো তবুও সেগুলো তো আর বেশিদিন রেখে দেয়া যেতো না; প্রয়োজনীয় অংশ ফটোকপি করে বইগুলো ফিরিয়ে দিতে হতো। তবে মিতুর কিছু বন্ধু মিলে পুরো বইটাই নীলক্ষেত থেকে ফটোকপি করে নিয়েছিলো, কিন্তু অমন অনৈতিক কাজে মিতুর মন সায় দেয় না। শফিক স্যারের কাছ থেকে ধার করা বইটা নিয়ে এমনই সাত-পাঁচ ভাবছিলো মিতু। এমন সময় সোমা আপু বললো-

"আরে, এই বইটাতো আমারও আছে"
"তুমি ফিজিক্সের ছাত্রী হয়ে ফিলিপ কটলারের বই দিয়ে কি করো?"
"কেন? ফিজিক্সে পড়লে বুঝি কটলারের প্রেমে পড়া যাবে না?"

মিতুকে আরো অবাক করে দিয়ে সোমা আপু ওই বইয়ের একটা অধ্যায় ওকে বুঝিয়েও দিলো। সেই থেকে মিতুর 'সোমা আপু অভিযান' শুরু। এরপর থেকে যখনি সে সুযোগ পেয়েছে তখনি সোমা আপুর সাথে সময় কাটিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই সে লক্ষ করলো সোমা আপু ওদের ব্লকের ভ্রাম্যমাণ অভিধানের মতো। ওরা হয়তো কোথাও বসে গল্প করছে অথবা ডাইনিং-এ খেতে যাচ্ছে, সেই সময় পাশ থেকে কোনো এক আপু বলে উঠলো "এই সোমা, 'অমুক' শব্দটার মানে কী রে?"
মিতু ভেবেছে অভিধান তো অনেকেই মুখস্ত করে (ওই সময়ে অনেকেরই এই প্রবণতা ছিল)।

কিন্তু না, সোমা আপু মিতু কে আবারো বিস্মিত করলো।

সে শুধু ওই শব্দের অর্থই বললো না, উপরন্তু তার নানাবিধ প্রয়োগ নিয়েও কথা বললো।

হয়তো সোমা আপুর সাথে মিতু কিছু খাচ্ছে – হঠাৎ সোমা আপু বললো, "মিতু, জানিস, এই খাবারের পুষ্টি উপাদান কী কী?" তারপর সোমা আপু শুধু ওই খাবারের পুষ্টি উপাদানই না বরং তার উদ্ভাবন কোন দেশে, কবে থেকে এদেশে খাবার প্রচলন হলো, ইত্যাদি বিষয়ে কথা বললো, আর মিতু তা মুগ্ধ হয়ে শুনলো।

সোমা আপু প্রচুর বই পড়তো। যেখানে হলের বেশিরভাগ মেয়ে শপিং এ গেলে ব্যাগভর্তি জামাকাপড়, প্রসাধন কিনতো, সেখানে সোমা আপু কিনতো বই। সে শুধু সংগ্রহ বাড়াতে বই কিনতো না, বইগুলো পড়তো এবং প্রয়োজনে ওই বইগুলো থেকে যে কোনো বিষয়ে যে কোনো সময়ে ছোটখাট একটা বক্তৃতাও দিতে পারতো।

অসাধারণ ছিল সোমা আপুর রুচিবোধ। সে কেবল হাল ফ্যাশনের সাজসজ্জা করতো এমনটা নয়, মাঝে মধ্যেই নতুন ফ্যাশন তৈরিও করতো। যাহোক, সোমা আপুর বিবরণী আপাতত শেষ। এবারে মূল গল্পে ফিরি...

সোমা আপুর রুমমেট হিসেবে মিতু বন্ধুমহলে অনেক গর্ব করতো। তবে বিপত্তিটা বাঁধলো অন্যখানে। সোমা আপু মশারি ছাড়া ঘুমাতে পারে না, আর মিতু মশারির মধ্যে ঘুমাতে পারে না, দমবন্ধ লাগে; অতএব তাদের বিচ্ছেদ অনিবার্য। আর তাছাড়া দুদিন পরপর ওদের রুমের বিভিন্ন জিনিস হারায়, যা কি না নতুন আগন্তুক হিসেবে মিতুর জন্য ভীষণ অস্বস্তিদায়ক। তাই মাস দুই পরে বর্ধিত ভবনের একটি কক্ষে মিতু তার এক বান্ধবীর সাথে শিফ্‌ট করলো। এরপর ক্লাস-অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় সোমা আপুর সাথে মিতুর আর তেমন কোনো যোগাযোগ থাকলো না।

এর পর কেটে গেছে প্রায় দুই বছর। ২০০৩ সাল। মিতু তখন তৃতীয় বর্ষে আর সোমা আপু অনার্স শেষ বর্ষে। তখন আবারো ফাইনাল পরীক্ষার জন্য সোমা আপু বেশ কিছুদিন যাবৎ হলে থাকছে। মাঝের দুই বছর মিতুর সাথে তার তেমন একটা যোগাযোগ না থাকলেও এবারে প্রায় নিয়মিত যোগাযোগ হতে থাকলো। খুব কাছের এক বন্ধুর অকাল প্রয়াণে মিতু তখন অনেকটাই বিষাদগ্রস্ত। মানুষের সঙ্গ তার তখন খুব একটা ভালো লাগতো না। কেননা কারো সাথে দেখা হলেই তারা মিতুর সদ্যপ্রয়াত বন্ধুকে নিয়ে উহু-আহা করতো। মিতু মূলত সে সব কথা শোনার ভয়ে সারাদিন ঘুমিয়ে থাকতো (যেহেতু তখন ক্লাস বন্ধ ছিল), আর সারা রাত স্টাডিরুমে থাকতো। শীতের রাত। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ। স্টাডিরুম থেকে বের হয়ে মিতু মাঠের পাশের রাস্তাটা ধরে হাঁটছিলো। হঠাৎ প্রধান ভবনের দিক থেকে খুব হৈচৈ শোনা যেতে

থাকলো। মিতু একটু এগিয়ে গেলেই অনুমান করতে পারলো হট্টগোলটা তার সেই প্রথম বর্ষের কক্ষ থেকেই আসছে। কী এক অজানা আশংকায় মন কেমন করে উঠলো ওর! খুব দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠে কক্ষের সামনের জটলাটা কাটিয়ে কোনোক্রমে ভেতরে ঢুকলো মিতু। সেখানে ঢুকে সে দেখলো সোমা আপু অজ্ঞান হয়ে বিছানায় পড়ে আছে, মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে তার। ততক্ষণে সহকারী হাউস টিউটর ম্যাডামও চলে এসেছেন। তিনি এসেই খুব দ্রুততার সাথে সোমা আপুকে মেডিক্যালে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে একে একে সবাই চলে গেলো, তারপর একটু ধাতস্ত হয়ে আরেক রুমমেট তুলি আপুর কাছ থেকে বিস্তারিত জানলো মিতু–

তুলি আপু ওই রুমের পুরাতন বাসিন্দা। উনি লক্ষ করেছেন প্রায়ই রুম থেকে কিছু না কিছু হারিয়ে যায় এবং এটা তখনই হয় যখন সোমা আপু হলে থাকে। যাই হোক এতদিন বিষয়গু-লাকে তুলি আপু খুব একটা পাত্তা না দিলেও এবারে আর তা পারলেন না। কেননা গতকাল রাত থেকে তুলি আপুর ল্যাপটপটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওনার থিসিসের সব ডকিউমেন্টসই ওই ল্যাপটপ-এ। তাই উনি স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে আর সংযত রাখতে পারেননি। তিনি সোমা আপুর অনুপস্থিতিতে তার লকার খোলার ব্যবস্থা করেন এবং রুমের অন্য সবার উপস্থিতিতে সোমা আপুর লকার থেকে শুধু তুলি আপুর ল্যাপটপই না, ইতোপূর্বে রুম থেকে হারানো আরো অনেক কিছুই উদ্ধার করা হয়। এমন সময় সোমা আপু এসে রুমে ঢুকেছে এবং বুঝতে পেরেছে যে সবাই সবকিছু জেনে গেছে। রুমের সবাই সোমা আপুকে অসম্ভব সম্মান করতো, তাই তারা বুঝতে পারে না তাদের ঠিক কী করা উচিত। তারপর রাতের খাবার খেতে সবাই এক সাথে ডাইনিং-এ গিয়েছিলো এই ভেবে যে খেয়ে এসে সোমা আপুর সাথে কথা বলবে। কিন্তু সোমা আপু কাউকে আর সেই সুযোগ দিলেন না।

তুলি আপুর কাছ থেকে বিস্তারিত জানার পরে মিতু কিছুক্ষণ বিহ্বল অবস্থায় বসে থাকলো। এতো শিক্ষিত, আর্থিকভাবে এতোটা স্বচ্ছল এবং সম্ভ্রান্ত একটি পরিবারের মেয়ে কেন এমনটা করবে- এটা কিছুতেই তার বোধে আসলো না। এরপর রুম থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে সোমা আপুর টেবিলে চোখ পড়লো তার, সেখানে পড়ার জন্য রাখা একটা বই, যার নাম 'ক্লেপটোমেনিয়া।'

সমুখে সুন্দর আগামী দিন

এম এম তোফাজ্জল হোসেন
এজিএম, ফ্যাক্টরি অপারেশন্স
অবনী ফ্যাশন্স লিমিটেড

দিনমজুর বাবার একমাত্র পুত্র সন্তান রমিজ উদ্দীন। মাত্র সাত বছর বয়সে দুটি ছোট বোনকে রেখে মৃত্যুবরণ করেন তার বাবা। তিনটি ছোট ছোট সন্তান আর সংসারের হাল ধরেন তার মা। গ্রামের বিভিন্ন পরিবারে ছুটা ঝিয়ের কাজ করে সংসারের খরচ চালানোর পাশাপাশি রমিজ উদ্দিনের পড়াশোনার দায়িত্ব নেন তিনি। মায়ের চেষ্টা আর মেধার কারণে স্কুল শিক্ষকদের সহায়তায় উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয় রমিজ উদ্দিন। বিএ পাস করে গ্রামে কয়েকটি টিউশনি করে সে। সংসারের অভাব আর সন্তানদের ভরণপোষণ করতে করতে কখন যে রমিজের মা এতটা বৃদ্ধ হয়েছে আর শরীরে এত রোগ বাসা বেঁধেছে তা টেরই পাননি তিনি। তাই রমিজ মাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে নিজের কাঁধে তুলে নেয় সংসারের হাল। গ্রামে থেকে এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পূরণ করা সম্ভব নয়, তাই নিজের পরিচিত এক বড় ভাইয়ের সহায়তায় ঢাকায় এসে চাকরি নেয় একটি বেসরকারি স্কুলে। টিউশনি এবং স্কুলের বেতন দিয়ে নিজের খরচ চালিয়ে মায়ের চিকিৎসা এবং ছোট বোনদের পড়াশোনা ও সংসারের খরচ মোটামুটি ভালোভাবেই চলছিলো। এভাবে তার আর্থিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছলতার মুখ দেখতে শুরু করে। এমতাবস্থায়, একই স্কুলের সহকর্মী শিক্ষয়ত্রীকে বিয়ে করে রমিজ। তাদের ঘর আলো করে জন্ম নেয় ফুটফুটে একটি কন্যা সন্তান। গ্রামের পরিবার আর শহরের পরিবার, দুটি পরিবারের ভরণপোষণ চালিয়ে খুব বেশি আর্থিক-ভাবে স্বাবলম্বী না হলেও মানসিকভাবে সে খুব সুখী। এভাবেই বেশ ভালোই কাটছিলো রমিজের জীবন।

কিন্তু... বিধাতার লিখন খণ্ডায় কার সাধ্য?

২০১৯ সাল, শুরু হলো মহামারি করোনার ভয়াবহতা। সমস্ত বিশ্বে সবকিছু এলোমেলো হতে থাকে ধীরে ধীরে। এর ভয়াল থাবা এসে আছড়ে পড়ে বাংলাদেশেও, বিশেষকরে রমিজ উদ্দিনের মতো স্বল্প আয়ের মানুষদের জীবনযাত্রায়। স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। প্রথম তিনমাস অর্ধেক বেতন দেয়া হয় তাদের, তারপর ২৫% এরপর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয় তাদের স্কুল। মায়ের চিকিৎসা খরচ, ছোট বোনদের পড়াশোনা, সংসার, ছোট সন্তানটির ভরণপোষণ, নিজের সংসার, ঘর ভাড়া এতগুলো খরচের হিসাব যেন তার মাথার

উপর এক পাহাড়সম বোঝা। কী করবে ভেবে পায় না, বিভিন্ন জায়গায় হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজতে থাকে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই যেখানে চাকরি সোনার হরিণ, সেখানে এই মহামারির সময় সেটিতো হীরার চেয়েও দামি। সংসারের টানাপোড়েনে দিশেহারা হয়ে পড়ে রমিজ। কিন্তু বেঁচেতো থাকতে হবে, তার যে অনেক দায়িত্ব। অনেকগুলো মুখ চেয়ে আছে তার দিকে, অনেকগুলো মানুষ আশায় বুক বাঁধছে তার জন্যই।

তাকে কিছু একটা করতেই হবে। তাই আর কোনো চিন্তা না করে, দুটি হাতে শক্ত করে ধরে রিকশার হাতল, আর দুটি পায়ে ঘোরায় রিকশার প্যাডেল। শিক্ষক রমিজ উদ্দিন এখন মাথায় ক্যাপ আর মুখে মুখোশ পরে ঢাকা শহরের অলিতে গলিতে রিকশা চালায়। নিজেকে লুকায় দারিদ্রতার কাছে, কিন্তু স্বপ্ন দেখে বেঁচে থাকার, বুকে বাঁধে নতুন দিনের আশা। কল্পনা করে আরো একটি বিশ্বের যেখানে করোনা মহামারি নেই, নেই দারিদ্রতার হাহাকার, নিশ্বাসে ছড়াবে শুধুই শান্তি। সাদা বলাকা উড়ে বেড়াবে নিরব শুদ্ধ আকাশে। যেখানে দুঃখীনি মায়ের মুখটি দেখাবে স্নিগ্ধ, আদরের বোনগুলো ছুটে বেড়াবে উঠোনের এককোণ থেকে আরেক কোণে, প্রিয়তমার মুখে ফুটবে সুখের হাসি। যেখানে নিজের ফুটফুটে বুকের মানিকটিকে আকাশের বুকে ছুড়ে মারবে আর নিস্পাপ হাসিতে পৃথিবীকে স্বাগত জানাবে তার আদরের কন্যা সন্তান।

এমন দিনের আশায় দুচোখ ভরে স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলে রমিজ উদ্দিন, আর তার সাথে আমরাও স্বপ্ন দেখি করোনা মহামারি শূন্য একটি সুন্দর পৃথিবীর।

চীনে চার

চৌধুরী মঈদুর রহমান
প্রাক্তন অফিসার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

বাংলাদেশ থেকে কুনমিং এর ইউনান ইউনিভার্সিটিতে আমাদের ব্যাচে ছিলো ষাট জনেরও বেশি। যার মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিলো তিন জনের সাথে– অর্জুন, উজ্জ্বল এবং সবুজ ভাই। সবার মধ্যে সবুজ ছিলো কনিষ্ট। সেমিস্টার শেষ। চীনে তখন আমাদের দ্বিতীয় বর্ষ। যেহেতু সেমিস্টার শেষ, সেহেতু আমরা চার জন চিন্তা করলাম কোথাও ঘুরতে যাবো। ব্যাস! যেই ভাবনা সেই কাজ। চারজনই বসে পরলাম চীনাদের অতি প্রচলিত "সি ট্রিপ" এবং "ছু-নার" অ্যাপ নিয়ে। উজ্জ্বল সাহেবের চীনা ভাষায় আমাদের চারজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দক্ষতা থাকায় তিনি সবার আগে একটি পরিকল্পনা দিতে সক্ষম হলেন আমাদের মাঝে। তিনি বললেন "ই'উ" যাবার কথা। চীনার অনেকগুলো ব্যবসায়িক শহর এর মতো "ই'উ"ও একটি। উজ্জ্বল সাহেব অনেক দিন ধরেই চাইছিলেন যেহেতু আমরা চীনে আছি সেহেতু আমাদের কিছু ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়া উচিত। ট্রেনে কুনমিং থেকে ই'উ যেতে সময় লাগবে দুইদিনেরও বেশি আর উড়োজাহাজে গেলে লাগবে চার ঘণ্টার একটু বেশি। কিন্তু উড়োজাহাজের টিকিটের মূল্য বেশি হওয়ায় আমরা ঠিক করলাম যে ট্রেনেই যাব। কিন্তু দুই দিন আমরা ট্রেনে কী করব? তখন আমাদের উজ্জ্বল সাহেব তার মস্তিষ্ক থেকে আরেকটি বুদ্ধি জুড়ে দিলেন। বুদ্ধিটা ছিলো এমন যে আমরা বিরতি নিয়ে নিয়ে যাবো। যার ফলে আমাদের একঘেয়েমিও লাগবে না আর আরও কিছু শহর ঘুরতে পারবো। চীনার অ্যাপ অনেক অত্যাধুনিক। মুঠোফোন দিয়ে সারা দুনিয়া আপনার হাতের মুঠোয় আনা সম্ভব, এই কথাটার বাস্তবতা আমি চীনে এসে দেখেছি। তড়িঘড়ি করে "সি ট্রিপ" অ্যাপ দিয়ে টিকিট কেটে ফেললাম আমরা চারজন।

ঠিক দুই দিন পর আমরা রওনা হলাম আমাদের ট্রেন সফরে। প্রথম সফর কুনমিং রেলওয়ে স্টেশন থেকে গুই ইয়াং। রাতে সফর করছি বলে ট্রেনে লোক সংখ্যা খুব কম। তাই সবাই চারটা করে সিট নিয়ে ঘুমাতে ঘুমাতে চলে গেলাম গন্তব্যে। চীনের ট্রেনের টিকিট চেকাররা সবসময়ে তাদের ইউনিফর্ম পরে পরিপাটি থাকে, আবার তাদের নির্ধারণ করা বগি বা কম্পার্টমেন্ট নিজেরাই ঝাড়ু মোছা করে। সকালে পৌঁছে গেলাম গুই ইয়াং এ। প্রথম দেখায়

আমার কাছে শহরটা তেমন ভালো লাগেনি। চারিদিকে শুধু রাস্তা মেরামত আর দালানকোঠা নির্মাণের কাজ চলছে। বাতাসে শুধু বালি। ছু-নার অ্যাপ দিয়ে আমরা দেখা শুরু করলাম যে, গুই ইয়াং এ কোন সুন্দর জায়গা আছে কি না। পেয়ে গেলাম "ছিয়েনলিং পার্ক" এর নাম। ছু-নার দিয়েই দেখে ফেললাম সেখানে যাওয়ার উপায়। বাস স্টপটা কোথায়, কীভাবে যেতে হবে, বাস আসতে কতক্ষণ লাগবে সবই দেখা যায় ছু-নার এ। চলে আসলাম ছিয়েনলিং পার্কে। দূর থেকে যখন দেখেছিলাম সেখানে ক্যাবল কার এ করে পাহাড়ে উঠা যায়। তখনই ঠিক করে ফেললাম ক্যাবল কার এ উঠবো। ক্যাবল কার এ করে পাহাড়ে উঠে বেশ ভালোই লাগছিলো। চারদিকটা নিস্তব্ধ, শুধু প্রকৃতি এবং আমরা। পাহাড় থেকে নিচে নামতে নামতে দেখলাম বানরের ঝাঁক। এখানকার মানুষগুলো বেশ আদর করে ফল খেতে দেয় বানরগুলোকে। ছবিও তুলে ফেললাম সেই দৃশ্যগুলোর। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাতের খাবারে খেয়ে নিলাম গুই ইয়াং এর বিখ্যাত খাবার "ওয়া ওয়া"। এটা হলো কয়েক ধরনের সবজি, যা কি না বিশেষ কিছু মসলা দিয়ে রান্না করা হয়। খেতে খেতে কেটে ফেললাম ট্রেনের টিকিট, পরবর্তী গন্তব্য "ছাংসা।" কিন্তু ট্রেনস্টেশন যেতে আমাদের একটু দেরি হয়ে গেলো। ট্রেন ছিলো রাত দশটার দিকে আর আমরা প্ল্যাটফর্মে পৌঁছলাম ১০টা বেজে ২ মিনিটে। চীনের ট্রেন এক মিনিটও বিলম্ব করে না বলে আমরা আমাদের ট্রেন ধরতে পারিনি। একে তো রাত তার উপর বিদেশ। কী করবো বুঝতে পারছিলাম না। চলে গেলাম স্টেশন এর টিকিট কাউন্টারে। তারা বলল, যদি আমরা এখনি একটা টিকিট কিনে ফেলি তাহলে আগামি দশ দিনের ভেতর মিস হওয়া ট্রেনের টাকা ফেরত পাবো। কিন্তু তখন আর সাধারণ ট্রেন ছিলো না। ছিলো শুধু "গাও থিয়ে" অর্থাৎ "বুলেট ট্রেন"। সাধারণ ট্রেনের চেয়ে বুলেট ট্রেনের টিকিটের দামের ব্যবধান অনেক বেশি, কিন্তু আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলে ৫০% ছাড় পেয়ে গেলাম।

ঠিক ১০:৩০ মিনিটে আমাদের বুলেট ট্রেন ছেড়ে দিলো পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশে। বুলেট ট্রেনের ভেতরটা বেশ পরিপাটি, সুন্দর। ঠিক যেন উড়োজাহাজের মতো। গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় ২৫০ কিলোমিটার এর চেয়েও বেশি। দ্রুতগতি হওয়া সত্ত্বেও স্থির। জানালার পাশে একটা পয়সা খাড়াখাড়িভাবে রাখার চেষ্টা করলাম এবং সফলও হলাম। বুলেট ট্রেন হওয়ায় আমরা সকাল সাতটায় ছাংসা পৌঁছে গেলাম। ছাংসা বেশ পরিপাটি এবং ছিমছাম এক শহর। রাস্তাগুলো বেশ পরিষ্কার। হালাল রেস্টুরেন্টও খুঁজে পেলাম। সকালের নাস্তা সেরে আবার খোঁজ শুরু করলাম অ্যাপ এ। জানতে পারলাম কাছেই একটা পাতাল ট্রেনের স্টেশন আছে, সেখান থেকে যাওয়া যাবে "ছিন ইউয়ান ছুন" পার্কে। পার্কটি নদীর মাঝখানে একটি দ্বীপে অবস্থিত। পাতাল ট্রেন সরাসরি আমাদের সেই দ্বীপের পাতালট্রেন স্টেশনে পৌঁছে দিলো। সেই পার্কে এসে আমরা জানতে পেলাম যে ছাংসা হলো চীনের জাতির পিতা "মাও শে তং" এর জন্মস্থল। সেখানে দুটি পাথরে খোদাই করা ছিলো মাও শে তং এর লেখা দুটি বিখ্যাত কবিতা যা কি না তিনি তার জন্মস্থলকে উদ্দেশ্য করেই লিখেছিলেন। দিক নির্দেশনা ম্যাপে দেখলাম তিন কিলোমিটার দূরে মাও শে তং এর একটি ভাস্কর্য আছে। সেটা দেখার উদ্দেশে

হাঁটা শুরু করলাম। হাঁটার সময় বেশ ঠান্ডা লাগছিলো। তখন তাপমাত্রা ছিলো ১০ ডিগ্রির মতো কিন্তু নদীর পাশে হওয়াতে ঠান্ডা একটু বেশিই লাগছিলো। ভাস্কর্যের দিকে যখন আমার প্রথম নজরটা গেল তখন বুকটা কেমন যেন কেঁপে উঠলো। সে এক সুবিশাল ভাস্কর্য। লম্বায় ১০৫ ফুট। আমি এর আগে এত বড় ভাস্কর্য কখনও দেখিনি। দ্বীপের নদীর ধারের দৃশ্যটা বেশ সুন্দর, তাই সবুজের নতুন কেনা মুঠোফোন আর সেল্ফিস্টিক দিয়ে কিছু ছবি তুলে ফেললাম। সবুজ বয়সে আমাদের চেয়ে কনিষ্ঠ হওয়ায় খুব একটা কথা বলে না। হয়তো আমাদের সম্মান করে বলে। কিন্তু ও যখন ওর সমবয়সি কারও সাথে থাকে তখন বোঝা যায় যে ও কতটা উৎফুল্ল এবং প্রাণবন্ত।

ছাংসা বেশ ভালো লেগে গেল আমাদের, তাই ভাবলাম একদিন থেকে যাই। ছু-নার দিয়ে দেখে ফেললাম কোথায় একটু সস্তায় হোটেল পাওয়া যায়। অ্যাপ দিয়েই হোটেল রুম বুকিং দিয়ে চলে গেলাম হোটেল এর উদ্দেশে। হোটেল এর নিয়ম হলো এক রুমে দুইজনের বেশি থাকা যাবে না। তাই আমরা ম্যানেজার কে বললাম যে আমরা বিদেশ থেকে তাদের দেশে পড়াশুনা করতে আসা ছাত্র আর আমরা গবেষণামূলক কাজে এখানে এসেছি। ম্যানেজার সাথে সাথে আমাদের কে একটি রুমের ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু উনি এও বলেলন যে আমরা যদি চাই তাহলে সে আরেকটি রুম আমাদের বিনামূল্যে দিতে পারবে কারণ তার মতে একসাথে চারজন এক রুমে থাকতে কষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা একটি রুমেই সন্তুষ্ট ছিলাম। পরদিন সকালে অ্যাপে দেখলাম একটু দূরে একটি পার্কে কাচের তৈরি একটি সেতু আছে। চীনের বিভিন্ন ছায়াছবি কিংবা গানে কাচের তৈরি সেতুর দৃশ্য অনেক দেখেছিলাম। বাস্তবে দেখতে পাবো তা ভেবেই ভালো লাগছিলো। রওনা হলাম কাচের সেতু দেখার উদ্দেশে। কাচের সেতুটা যেই পার্কটা তে অবস্থিত সেই পার্কটা এক অজপাড়া গাঁ এলাকাতে। মানুষ নেই বললেই চলে। যারাই আছে তারা আবার চীনা ম্যান্ডারিন ভাষা বলতে পারে না। এমনকি একটি দোকানে দেখলাম কুকুর মেরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, তারা নাকি সেটা খাবে। খানিকটা পথ হাঁটার পর আমরা আমাদের সেই কাচের সেতুর পার্কে এসে পৌঁছলাম। এখানেও আমরা পার্কের টিকিট মূল্যে ৫০% ছাড় পেয়ে গেলাম। কাচের সেতু ছাড়াও সেখানে ছিলো জিপ লাইন আর বোট রাইড। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে জিপ লাইন আর বোট রাইড করার মজাই আলাদা। এরপর আমরা আমাদের বহুল প্রতীক্ষিত কাচের সেতুর দিকে চলে আসলাম। শুনেছি কাচের সেতুতে নাকি অনেক ভয় লাগে কিন্তু আমাদের কারো তেমন কোনও ভয় লাগেনি তবে সেতুতে উঠে চারপাশের পাহাড়ের দৃশ্য বেশ ভালো লাগছিলো। হালকা মেঘ এসে আমাদের গায়ে লাগছিলো তাই একটু ঠান্ডা ঠান্ডাও লাগছিলো। রাত দশটায় আমাদের ট্রেন ই'উর উদ্দেশে ছেড়ে যাবে তাই সন্ধ্যা হবার আগেই বেরিয়ে পড়লাম হোটেলের উদ্দেশে। হোটেলের ম্যানেজার আমাদের ট্যাক্সি ঠিক করে দিলেন এবং আবার আসার কথা বললেন। আমরাও ট্যাক্সি করে ট্রেনস্টেশনে চলে গেলাম।

ব্যবসায়িক শহর ই'উ তাই নিরাপত্তা কর্মীও প্রচুর। নিরাপত্তাজনিত নানারকম প্রক্রিয়া শেষে

আমরা ট্রেনস্টেশন থেকে বের হলাম। হোটেলে এখানেও একই নিয়ম তাই আমাদের পদ্ধতিও সেই ছাংসা এর মতো। হোটেলে আমাদের ব্যাগ রেখে রওনা দিলাম ই'উ পাইকারি মার্কেটে। যতই হাঁটি ততই বিস্মিত হই মার্কেটটা দেখে। এত বড় মার্কেট আমি আমার জীবনে কখনও দেখি নাই। বলে রাখি, মার্কেটটাতে এক ব্লক থেকে আরেক ব্লকে যাওয়ার জন্য বাসের ব্যবস্থা আছে। আর এত ধরনের জিনিস পাওয়া যায়, তা বলে শেষ করা যাবে না। ইলেকট্রনিক আইটেম থেকে গিফ্‌ট আইটেম পর্যন্ত, জুয়েলারি আইটেম থেকে জামা কাপড় পর্যন্ত সকল ধরনের জিনিস সেখানে পাওয়া যায়। উজ্জ্বল সাহেব ইতিমধ্যে একজন বাংলাদেশি ভাই যিনি কি না সেখানেই থাকে, তার সাথে যোগাযোগ করে কিছু পণ্য কেনাকাটা করে বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। মার্কেটটা অনেক সময় নিয়ে ঘুরলাম কিন্তু এটা একদিনে শেষ করার মতো কাজ নয়। দেখে বোঝা যাচ্ছিলো যে সবাই একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাই ঠিক করলাম, সবাই হোটেলে ফিরে যাবো। হোটেলে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে যখন অ্যাপ দেখছিলাম তখন জানতে পেলাম ই'উ থেকে সাংহাই খুবই কাছে। ঠিক করলাম পরেরদিন সকালে আমরা সাংহাই যাবো তাই রাতেই অ্যাপের মাধ্যমে আমরা সবাই ট্রেনের টিকিট কিনে ফেললাম।

সকালের নাস্তা শেষ করে আমরা সবাই সাংহাইয়ের উদ্দেশে রওনা দিলাম। সাংহাই নিয়ে কত ছবি, কত চলচ্চিত্র দেখেছি আর সাংহাইয়ের এত কাছাকাছি এসে সেখানে যাবো না তা কি হয়! যখন আমরা সাংহাইতে নামলাম তখন তাপমাত্রা ছিলো ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, অনেক ঠান্ডা। তড়িঘড়ি করে বাস খুঁজে বের করলাম। আমরা যাবো "ফুতং" এ। ফুতং হচ্ছে সাংহাইয়ের কেন্দ্রবিন্দু বা ডাউনটাউন। চীনারা ফুতংকে আরও বলে "গাও লোউ লিং লি" অর্থাৎ লম্বা দালানকোঠার জঙ্গল। আমাদের বাস তখনও অনেক দূর ফুতং থেকে তাও আমরা ফুতংয়ের বেশ কিছু দালানকোঠা দেখতে পাচ্ছিলাম এক সেতু থেকে। বাসটাতে বসে অনেক আরাম লাগছিলো কারণ বাসের ভেতর হিটিং ব্যবস্থা ছিলো। চীনের বাস ভাড়াও বেশ কম। পৌঁছলাম ফুতংয়ে। এ যেন এক অদ্ভুত জায়গায় আমরা এসে পড়লাম। শতাধিক দালানকোঠা আছে, যা কিনা পঞ্চাশ তলার উর্ধ্বে যার মধ্যে দুটি একশত তলার উর্ধ্বে। আর এত সুন্দর স্থাপত্যশিল্প যা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আমরা ঠিক করলাম একটাতে তো উঠতেই হবে। একশত তলা দালানকোঠা বলে কথা, তাই টিকিট কাটতে হলো। "সাংহাই ওয়ার্ল্ড ফিনান্সিয়াল সেন্টার" এর একশত তলাতে উঠতে টিকিটের মূল্য ছিল একশত RMB অর্থাৎ বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ১২০০ টাকার মতো। এটাই ছিলো আমাদের সমগ্র ভ্রমণের সবচেয়ে বেশি খরচ। নিচ তলা থেকে পাঁচ তলা আমরা গেলাম একটি সাধারণ লিফটে। এরপর আমরা উঠলাম সুপার লিফটে, দেখে লাগছিলো অন্য কোন গ্রহের স্পেইস শিপের মতো। মাত্র ৫০ সেকেন্ড লাগলো ১০০ তলায় পৌঁছতে। লিফট থেকে বের হয়ে যখন জানালার পাশে দাঁড়ালাম তখন দেখতে পেলাম এক অসাধারণ দৃশ্য। কী সুন্দরই না সাংহাই! কত মানুষের পরিশ্রম, মেধা, আর স্বপ্ন দিয়ে তৈরি এই শহর।

আবহাওয়া অনেক ঠান্ডা হওয়াতে আমরা বাইরে বের হতে পারছিলাম না। তাই বিভিন্ন শপিং মলেই ঘুরে ঘুরে সময় কাটালাম। আমি গিয়েছিলাম একটি দোকানে, এসে দেখি উজ্জ্বল সাহেব অর্জুন সাহেবকে নিয়ে বেশ হাসাহাসি করছে। কারণ জানতে চাইলে জানতে পেলাম অর্জুন সাহেব জামাকাপড়ের সাথে আগামী সেমিস্টারের বইও নিয়ে এসেছে। উজ্জ্বল সাহেবের মতে ঘুরতে আসলে আবার পড়াশুনা করার সময় পাওয়া যায় নাকি! কিন্তু আমি নিলাম অর্জুন সাহেবের পক্ষ, কারণ বাংলাদেশে লুচি ভাজা, সেমাই আর দুধ চা হয়তো অনেক সহজলভ্য কিন্তু কুনমিং-এ এগুলো শুধুমাত্র অর্জুন সাহেবের ডর্মিটরিতেই পাওয়া যাবে। রাত হলো কিন্তু ইচ্ছা করছিলো না সাংহাই ছেড়ে আসতে। ভাবলাম একদিন থাকবো কিন্তু সাংহাইতে সবকিছুরই অনেক দাম তাই আর সাহস করলাম না। এবার ফিরে যাবার পালা। ফিরে যাবো কুনমিং-এ। ট্রেন এর টিকিট কাটতে যাবো তখনই দেখলাম সাংহাই আর কুনমিং এর মাঝামাঝি আরেকটি শহর পরে। ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ১% লোকও হয়তো শহরটির নাম জানতো না অথচ এখন প্রায় সবাই শহরটির নাম জানে। শহরটির নাম উহান।

প্রচুর ঠান্ডা তাই ভাবলাম ট্রেন স্টেশন থেকে আর বের হবো না। কারণ ঠিক আট ঘণ্টা পরেই কুনমিং যাওয়ার ট্রেন ধরতে হবে। কিন্তু জানা গেল অর্জুন সাহেবের এক বন্ধু উহান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত আছেন, নাম মেহেদি। মেহেদি সাহেব আমাদের সবাইকে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তাই আমরা সবাই উহান বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে রওনা হলাম। জীবনে সর্বপ্রথম তুষারপাত দেখতে পেলাম উহানে। তাপমাত্রা তখন ছিলো -২ ডিগ্রি। আমি ভেবেছিলাম আমাদের ইউনান বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বড় কিন্তু উহান বিশ্ববিদ্যালয় দেখার পর আমার ধারণা পাল্টে গেল। পুরো উহান বিশ্ববিদ্যালয়টি পাহাড়ে অবস্থিত। উহান বিশ্ববিদ্যালয়ের নিচে অবশ্য একটি লেকও আছে। বন-জঙ্গল, পাহাড়, খেলার মাঠ, ভাস্কর্য, কী নেই উহান বিশ্ববিদ্যালয়ে! সেই সাথে মেহেদি সাহেবের আতিথেয়তা। সব মিলে যেন মনে হচ্ছিল "চেরি অন দ্যা টপ।" সময় চলে এলো বিদায় নেবার। খাওয়া দাওয়া করে রওনা হলাম কুনমিং এর উদ্দেশে। এমন একটি অভিজ্ঞতা আমার চিরকাল মনে থাকবে। সবকিছু আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে গেলে ইনশা আল্লাহ আবারও ঘুরতে বের হবো অন্য কোনও দেশে, অন্য কোনও জায়গায়। "জাই চিয়েন" অর্থাৎ আবার দেখা হবে।

মুহূর্ত

মো. গোলাম মাওলা
প্রজেক্ট ম্যানেজার
নিউজেন টেকনোলজি লিমিটেড

আমাকে ডেকো এক প্রভাতে
এসো তুমি বাঁশঝাড়ের পাতার ফাঁকে ফাঁকে সরু আলোকরশ্মি হয়ে,
যাবো ভেসে হিম শীতলতায় উষ্ণতা ছড়াতে!

আমাকে ডেকো এক বিকেলে
নীলচে আকাশের সাথে মিশে, এসো তুমি শাড়ি পরে,
নদীর পাড় ধরে হেঁটে হেঁটে দিগন্তের নীলিমায় যাবো হারিয়ে, ফিরবো না আর নীড়ে!

আমাকে ডেকো এক সাঁঝের বেলা
পুবের কোণে উঁকি দেয়া চাঁদের আবছা আলোয়, এসো জোনাক হয়ে,
অনুভব ছড়িয়ে নেবো জড়িয়ে, আলো ছায়ায় মিশে রবো, সাঁঝের তারার সাথে!

কোনো এক গভীর রাতে
ঝর্ণাতলায় এসো তরী হতে,
মাঝি হয়ে ভাসবো দু'জন, একাত্ম হয়ে যুগল সরোবরে!

বাবাকে মনে পড়ে

মো. খায়রুল বাশার
প্রাক্তন সিনিয়র অফিসার, অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

বাবার সাথে শেষ কথাটুকু
ঠিক মনে নেই,
আমিই ফোন দিয়েছিলাম তাকে
তখন তিনি ছিলেন গ্রামের পৈত্রিক ভিটাতে।
অস্পষ্ট স্মৃতি-
তার প্রতি আমার কথাগুলোতে
ছিলো অধিকারবোধ, বকা দেওয়ার সুরে
বললাম সময় মতো খেতে,
ঘুমাও নাতো নিয়ম করে।
আমার বকা শুনে একটু মৃদুস্বরে হেসেছেন
বলেছিলেন 'বাপ আমার, ঠিক আছে।'
তার পরদিন কী যেন কী হলো
আসরের নামাজ পড়ে
প্রচণ্ড কষ্ট বুকে
অসুস্থ হয়েছে সে
ডাক্তার আনা হয়েছে
ফোনে কাঁদো কাঁদো সুরে
জেঠাতো ভাই বলছে।
তখন সন্ধ্যা–
অজানা অনিশ্চয়তা নিয়ে
দুই ভাই ছুটলাম বাড়ির পানে
বাস ছুটে চলছে
যখন আমরা বাবুগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে
তখনও অনেক দেরি রাত পোহাতে
সেই আঁধার রাতে
মাইলের পর মাইল পথ পাড়ি দিয়ে
জীবিত অবস্থায় পাইনি তারে
বাঁশঝাড়ের পাশে এখন শায়িত আছেন

বাবা আমার।
কষ্ট হলে চোখে পানি আসে
সেদিন কষ্ট ছিলো অশ্রু ছিলো না।
তারপরও অনেকদিন বাবার
প্রতীক্ষায় ছিলাম বাবা আসবে
কিন্তু বাবা আর আসেনি,
বাবা তো বহুদূরে, আসবে কী করে!

স্মৃতির নগরী

মো. আসমাতুল্যাহ (গালিব)
প্রাক্তন জুনিয়র অফিসার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
অবনী টেক্সটাইলস লিমিটেড (নিটিং)

এই নগরীর স্মৃতি গহনে আছে একটি ভ্রমর
সতত হে বিবাগীনি
তাকে খুঁজে ফেরে ক্ষিপ্ত বয়সি কাল
অন্তরে যার চিরজীবী যৌবন।

এই নগরীতে শৈশব ধরা আছে
ঘন আঁধারেতে জোনাকির আলো হেন
স্মৃতির কুয়াশা-কুহেলিরা জাল বোনে
ফেরারি সে শিশু আর তো ফেরে না যেন।

অভিমানী এক অভিমন্যুর মতো
চক্রবুহ্য হতে প্রবেশের পথ জানে
জানে না কোথায় কেমনে নিষ্ক্রমণ
মহারথী কাল নিঠুর খড়্গ হানে।

প্রাণ-ভ্রমরের হদিস তো তবু নেই
শুধু আসা যাওয়া ব্যস্ত নগরীর পথে পথে
শৈশব গেছে যৌবন আছে জীবনও যে যায় যায়
কুলনাশিনী সে প্রাণের নগরী
নতুন প্রেমিক খোঁজে।

অন্ধকারে ছুটে চলা

মো. ফরহাদ হোসেন নির্জন
সিনিয়র অফিসার, মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং
ব্যাবিলন গ্রুপ

সেই পাতা ঝরা উদাস ফাল্গুনের বিকেল
চারদিকে কোকিলের ডাক,
আম গাছগুলোর সমস্ত শরীর ভর্তি অজস্র মুকুল
ঝড়ো বাতাসে কেবলই ঝরে পরে।
গোধুলীর শেষ লগ্ন
ক্লান্ত পায়ে পথ চলে পথিক,
আর নীড় খুঁজে পাখি।

এমনি এক ক্ষণে যখন বারান্দায় গিয়ে বসলাম
তখনি ঘনিয়ে এলো– একখানি বিষণ্ন সন্ধ্যা,
আর তারই সাথে অতি দূর থেকে ভেসে আসা এক অপরূপ বাতাস
যাতে কেবলই জড়ানো ছিলো–
স্মৃতির অসংখ্য কারুকার্য আর একখানি দীর্ঘশ্বাস।

পৃথিবী নামক রঙ্গমঞ্চে আমার জীবন স্ক্রিপটা খুবই ছোট
এই ছোট্ট জীবন পরিসরে সকলের মাঝে মিলেমিশে থাকার
তীব্র আকাঙ্খা খেলা করতো আমার সমস্ত ভাবনার মাঝে।
কিন্তু ভাগ্য যে বড়ই অসহায়!
আমার এমনি করে দেখা স্বপ্নের স্মরণাপন্ন হতে সে বিরক্ত করে।

আমার ছোট্ট এই জীবন পরিসর নানা দুর্ঘটনায় বিভক্ত
তবে আমি কাঁদতে পারিনি কোনোদিন
প্রথমত পৃথিবীতে আসাই ছিলো আমার প্রথম দুর্ঘটনা
অজানা এক দাসত্ব ও অনাকাঙ্খিত কিছু অবহেলা
সবই আমার জীবন দুর্ঘটনা
সবকিছু থাকতেও কেন জানি আমি ছিলাম বঞ্চিত।

তারপরও জীবনের বিশেষ কোনো পর্বে
আকাশের মতো বিশাল হতে চেয়েছিলাম

নদীর স্রোতের মতো বেগবান হতে চেয়েছিলাম
ফুল হয়ে বাগানে ফুটতে চেয়েছিলাম
রাতের ঠিকানায় স্বর্গ সাজাতে চেয়েছিলাম
হতে চেয়েছিলাম অনেক কিছু
হতে চাওয়ার সাধনায় মগ্ন হয়ে জেনেছিলাম
সঞ্চিত বেদনায় আকাশের নীল হওয়া গল্প
আপন কান্নায় নদীর ভরপুর হওয়ার গল্প
বিরহকালে সাদা মেঘ কালো হওয়ার গল্প
পূজা শেষে ফুলের পদদলিত হওয়ার গল্প
নরকের দীর্ঘশ্বাসে রাতের কালো হওয়ার গল্প
সময়ের ব্যবধানে হাওয়াতে হাওয়ার মিশে থাকার গল্প শুনে
নিজেকে আজও মেলে ধরতে পারিনি
পারিনি আজও মনের গভীরে লুকানো অভিমান মুছে ফেলতে।

রঙিন এই জগৎ সংসারের সব রঙই দেখা হলো আমার
তবে কেন রঙিন সব মানুষের ভীড়ে
জীবন আমার রইলো পড়ে সাদাকালো বাঁধা ফ্রেমে!
অনেকটা পথ হেঁটেছি আমি
চোখের সামনে দিগন্তের মতো প্রসন্ন ভবিষ্যৎ
একটু ছুঁয়ে দেখবো বলে
ছুটছি এক অজানা নীড়ে।
দূর, বহু দূর আরও কত দূরে যাচ্ছি চলে
ফেরা হবে কি আমার সেই স্বপ্ন দেখা নীড়ে?

সময়ের ব্যবধানে ক্রমশ জটিল হয়ে যাচ্ছে জীবনের হিসেব
চিরচেনা মানুষগুলোকে আজ অচেনা লাগে।
চারদিকে ধ্বংসস্তুপ যেন
সভ্যতা তাকিয়ে আছে বিলুপ্ত ইতিহাসের দিকে
অন্ধকার, চারদিকে ঘোর অন্ধকার
আমি পথ হারাণো দিশেহারা এক পথিক
ছুটছি, কেবলই ছুটছি...

বাড়িওয়ালি

এসএম এমদাদুল ইসলাম
পরিচালক
ব্যাবিলন গ্রুপ

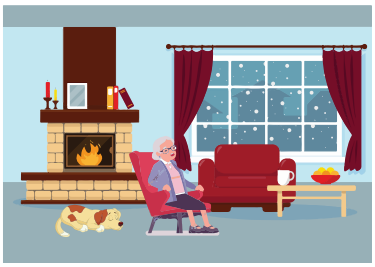

একটা ধীরগতির ট্রেন ধরে লন্ডন থেকে আসছে বিলি উইভার। পথে সুইনডন এসে ট্রেন বদলাতে হয়েছে। বাথ-এ পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত ন'টা বেজে গেল। স্টেশনের উল্টোদিকের বাড়িঘরের উপর দিয়ে তারা ভরা আকাশে তখন চাঁদ উঠে পড়েছে। আকাশ পরিষ্কার হলেও বাইরে কনকনে ঠান্ডা, বাতাস বরফের পাতলা ছুরির মতো এসে গালে লাগছে। 'এই যে, ভাই,' বলল সে, 'এখান থেকে কাছাকাছি কোনো সস্তা হোটেলের খবর বলতে পারবে?'

'বেল এন্ড ড্রাগন চেষ্টা করে দেখতে পারেন,' হাত দিয়ে ইশারা করে জবাবে বললো পোর্টার। 'ওখানে রুম মিলতে পারে। ও দিকটা ধরে হাঁটলে সিকি মাইল।'

বিলি লোকটাকে ধন্যবাদ দিয়ে তার স্যুটকেস তুলে নিয়ে নির্দেশিত পথে হাঁটা শুরু করলো দি বিল এন্ড ড্রাগনের উদ্দেশে। এর আগে কখনও বাথে আসেনি সে। এখানকার কাউকেই চেনে না। তবে মি. গ্রিনস্লেড বলেছেন যে শহরটা চমৎকার। 'থাকার জায়গা খুঁজে নাও,' আরো বলেছেন তিনি, 'তারপর একটু থিতু হয়ে পরে গিয়ে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের কাছে রিপোর্ট করো।'

সতেরো বছর বয়স বিলির। নতুন নেভি-ব্লু ওভারকোট পরে আছে, মাথায় টেপ খাওয়ানো নরম ফেল্টের হ্যাট, ভেতরে বাদামি স্যুটটাও নতুন। দারুণ ফুরফুরা মেজাজে আছে সে। বেশ জোরেই হাঁটছে বিলি। ইদানিং সব কাজেই সে খুব চটপটা। তার ধারণা সব সফল ব্যাবসায়ির একটা জায়গায় মিল, এরা খুব চটপটে হয়। হেড অফিসে বড়ো কর্তাদের মধ্যেও সে ব্যাপারটা লক্ষ করেছে, সবাই চটপটা, ছটফটা। অসাধারণ লাগে তার এদেরকে।

যে চওড়া রাস্তাটা ধরে সে হেঁটে চলেছে তার উপরে কোনো দোকানপাট নেই, দু'ধারে উঁচু উঁচু বাড়ির সারি কেবল, দেখতে সব একরকম। রয়েছে পিলারওয়ালা গাড়িবারান্দা, আর সামনের দরজা পর্যন্ত উঠে গেছে চারটে বা পাঁচটা সিঁড়ি। দেখলে বোঝা যায় এক কালে বাড়িগুলো দর্শনীয়ই ছিল। কিন্তু এখন এই অন্ধকারেও দেখা যায় দরজা-জানালার কাঠ থেকে রং উঠে আসছে মোচড় খেয়ে, সামনের সাদা চেহারায় ফাটল ধরেছে, এখানে সেখানে ছোপ ছোপ দাগ।

হঠাৎ করে একটা বাড়ির নিচতলার জানালার দিকে নজর গেল তার। ছ'গজ খানেক দূরে অবস্থিত রাস্তার বাতি জানালাটির উপর উজ্জ্বল আলো ফেলেছে। সেই আলোয় বিলি দেখতে পেলো, জানালার কাচের উপরে একটা ছাপানো নোটিশ লাগানো রয়েছে। তাতে লেখা, বেড এন্ড ব্রেকফাস্ট। নোটিশের ঠিক নিচেই একটা টবে সুন্দর একটা গাছ শোভা পাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে গেল সে। তারপর একটু কাছে আসলো বিলি। জানালার দুই ধারেই ঝুলছে সবুজ মখমলের পর্দা। পর্দার পাশে পুসি-উইলোর সবুজ চারা মানিয়েছে সুন্দর। আরেকটু কাছে এগিয়ে গেল সে, জানালার কাচে উঁকি দিয়ে রুমের ভিতরে প্রথমে যেটা দেখতে পেলো সেটা হলো ফায়ারপ্লেসে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে থাকা আগুন। আগুনের সামনে কার্পেটে গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে আছে সুন্দর একটা জার্মান ডাকসোন্ট জাতের কুকুর, পেটের সাথে নাক ঠেকিয়ে। স্বল্প আলোয় সে যতটা দেখতে পাচ্ছে তাতে মনে হলো রুমটা সুন্দর সব আসবাব দিয়ে সাজানো। একটা ছোটো মতো গ্র্যান্ড পিয়ানো, বড়ো সোফা, মোটাসোটা কিছু হাতাওয়ালা চেয়ার। দেখলো, ঘরের এক কোণে খাঁচার ভিতরে রয়েছে একটা বড়ো কাকাতুয়া। বিলির ধারণা, এ ধরনের বাড়িতে পশু-পাখি থাকাটা একটা সুলক্ষণ। সব মিলে তার মনে হলো এরকম বাড়িতে অবস্থান মজারই হবে। দি বেল এন্ড ড্রাগনের চাইতেতো ভালো হবেই।

তবে তার এও মনে হলো যে বোর্ডিং হাউজের চাইতে একটা পাব আরো আরামদায়ক হবে। সেখানে বিয়ার পাওয়া যাবে, ডার্ট ছোড়ার সুযোগ আর গল্প করার জন্য অনেক লোকজন – সব আছে একটা পাব-এ। সম্ভবত বেশ সস্তাও হবে। এর আগে একবার দু'রাতের জন্য একটা পাব-এ থেকেছে সে, ভালো লেগেছে তার। অন্যদিকে বোর্ডিং হাউজে থাকেনি কখনও, আর সত্যি বলতে কী এ ব্যাপারে তার একটু ভীতিই বরং আছে। বোর্ডিং হাউজ নাম শুনলেই মনে হয় জলে ভেজানো বাঁধাকপি, লোভী দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো মহিলা মালিক, লিভিং রুমে জারিত করে রাখা মাছের তীব্র গন্ধ।

দুই তিন মিনিট ঠান্ডার মধ্যে এই রকম একটা দোলাচলের মধ্যে থেকে শেষ পর্যন্ত বিলি ভাবলো সে আরেকটু হেঁটে গিয়ে বরং দি বেল এন্ড ড্রাগনটা দেখে আসবে। সেই ভেবে সে ঘুরে দাঁড়ালো।

এরপর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো। সে যখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে চলে যাবার উদ্দেশে ঠিক তখন আবার তার চোখ গেল সেই আলোকিত সাইনটির দিকে। বেশ একটু কায়দা করেই যেন লেখা – বেড এন্ড ব্রেকফাস্ট, বেড এন্ড ব্রেকফাস্ট, বেড এন্ড ব্রেকফাস্ট। প্রতিটা অক্ষর যেন একেকটা বড়ো বড়ো কালো চোখ – কাচের ভেতর থেকে চেয়ে রয়েছে তার দিকে, চলে যেতে মানা করছে তাকে। বলছে – থেকে যাও, নড়ো না, অন্য কোথাও যেয়ো না। পরে অনেকটা ঘোরের মধ্যেই যেন সে রাস্তায় না উঠে পাশের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে লাগলো দরজার দিকে, আর নিজের অজান্তেই যেন তার আঙুল ছুঁলো কলিং বেলের নব।

বেলের বোতামে চাপ দিল সে। অনেক ভেতরে কোনো একটা কক্ষে বেল বাজার আওয়াজ শুনলো সে। কিন্তু ঘণ্টা বাজাবার বোতাম থেকে তার হাত সরিয়ে নেবার আগেই

যেন দরজা খুলে গেল। খোলা দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে এক মহিলা। বেলের বোতাম টেপার অন্তত আধা মিনিট পরে সাধারণত দরজা খুলবে, এটাই দস্তুর। এ মহিলা দেখছি ঠিক স্প্রিঙের পুতুলের মতো। ঢাকনা খোলা মাত্র লাফিয়ে খাড়া! বেশ চমকে গেলো বিলি।

মহিলাটির বয়স পয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে হবে। বিলিকে দেখেই একগাল উষ্ণ হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি তাকে।

ভেতরে এসো,' বললেন তিনি খুব মিষ্টি করে। তারপর এক পাশে সরে গিয়ে দরজাটা মেলে ধরলেন বড়ো করে। বিলি আবিষ্কার করলো কখন যে সে যন্ত্রচালিতের মতো ঢুকে গিয়েছে ভিতরে। এ যেন অনেকটা বাধ্য হয়ে, বা আরো সঠিক বললে, মহিলাকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢোকার ইচ্ছাটা ছিল তার অপ্রতিরোধ্য।

'বাইরে জানালায় একটা নোটিশ দেখলাম,' বলল সে দাঁড়িয়ে পড়ে।

'হ্যাঁ, জানি।'

'ভাবছিলাম একটা রুম যদি পাওয়া যায়।'

'রুম একদম তৈরি, বাছা,' বললেন তিনি। গোলাপি মুখখানা তার গোলাকার, আর খুবই নিরীহ একজোড়া নীল চোখ। 'আমি আসলে দি বেল এন্ড ড্রাগনের উদ্দেশে যাচ্ছিলাম,' বলল তাকে বিলি। 'কিন্তু আপনার জানালার ওই নোটিশটা হঠাৎ চোখে পড়লো।'

'বাছা আমার,' বললেন তিনি, 'ঠান্ডায় আর দাঁড়িয়ে না থেকে ভেতরে আসছো না কেন তুমি?'

'ভাড়া কতো রাখেন আপনি?'

'এক রাতের জন্য পাঁচ শিলিং ছয় পেনি, সকালের নাস্তা সহ।'

অসম্ভব সস্তা। তার বাজেটের অর্ধেকের চাইতেও কম।

'খুব বেশি মনে হচ্ছে?' বললেন মহিলা, 'তাহলে আরেকটু সস্তা করে দিতে পারি। নাস্তায় ডিম চাই তোমার? ডিমের দাম একটু বেশি এখন। ডিম না খেলে ছয় পেনি কম পড়বে।'

'না, না, দাম একদম ঠিক আছে,' বলল সে। 'এখানে থাকবো আমি।'

'আমারও তা মনে হয়েছে। চলে এসো ভেতরে।'

দারুণ ভালো মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলাকে। এ যেন কোনো এক ছেলের বন্ধুর মা, ছেলেটি বড়োদিনের ছুটিতে বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে এসেছে, আর মা'টি তাকে বাড়িতে সাদরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। বিলি তার হ্যাট খুলে প্রবেশদ্বারের দিকে এগিয়ে গেল।

'এখানে ঝুলিয়ে দাও,' বললেন মহিলা, 'এবার তোমার কোটটা খুলে রাখছি আমি।'

হলে ঢোকার জায়গাটাতে অবশ্য আর কোনো হ্যাট, বা কোট কিছু নেই ঝোলানো। এমনকী কোনো ছাতা, হাঁটার লাঠি – কিছুই নেই।

'আজ শুধু আমরাই, আর কেউ নেই,' তাকে নিয়ে উপরে উঠতে উঠতে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন তিনি। 'বুঝতেই পারছো প্রায়ই এমন সৌভাগ্য হয় না আমার যে কোনো অতিথিকে আমার এই ছোট্ট গরীবখানায় আশ্রয় দেই।'

বয়স্কা মহিলাটি কিছুটা যেন ছিটগ্রস্ত, ভাবলো বিল। কিন্তু এই সস্তায় রুম পেলে কে

মাথা ঘামায় মহিলার মাথার ছিট নিয়ে?

'আমার তো মনে হয়েছে আপনার এখানে থাকার জন্য লাইন লেগে যাবার কথা,' বিনয়ের সাথে বলল সে।

'সেটা ঠিক, বাছা, সেটা ঠিক। ব্যাপারটা ওই রকমই। কিন্তু সমস্যা হলো যে, আমি, ওই ধরোগে, একটু খুঁতখুঁতে ধরনের। পছন্দ না হলে ঠিক – বুঝতে পারছো নিশ্চয় কী বলতে চাচ্ছি?'

'জি জি, বুঝতে পারছি।'

'তবে আমি সবসময় প্রস্তুত। এ বাড়িতে সব কিছু প্রস্তুত থাকে দিন-রাত। কখন কোন পছন্দনীয় কোনো যুবাপুরুষ চলে আসে। আর সেটা যে কী আনন্দের! কীভাবে বোঝাবো তোমাকে যে যখন দরজা খুলে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, যে কিনা সব দিক থেকে আমার মনের মতো।' সিঁড়ি টপকে উঠতে উঠতে মাঝামাঝি এসে একটা হাত রেলিঙে রেখে থামলেন তিনি, আর তার পাণ্ডুর ঠোঁট জোড়ায় হাসি মেখে মাথা ঘুরিয়ে বিলের দিকে চাইলেন। 'ঠিক তোমার মতো কেউ,' বললেন তিনি, তার দৃষ্টি তখন বিলিকে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে।

প্রথম তলা ওঠার পর সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে এসে তিনি বললেন, 'এই তলাটা আমার।'

দ্বিতীয় দফা সিঁড়ি টপকানো হলো। 'এই তলা তোমার,' বললেন তিনি। 'এটা তোমার রুম। আশা করি পছন্দ হবে তোমার।' বলে তিনি বিলিকে একটা ছোটো কিন্তু চমৎকার বেডরুমে এনে ঢুকালেন, সেই সাথে ঘরের বাতি জ্বালিয়ে দিলেন।

'সকালের রোদ এসে লাগে জানালায়, মিস্টার পারকিনস। পারকিনস তো, না কি?'

'না, উইভার।'

'মিস্টার উইভার। কী সুন্দর নাম! আমি একটা গরম পানির বোতল রেখেছি বিছানার চাদরের নিচে, মিস্টার উইভার। নতুন বিছানায় চাদরের নিচে গরম পানির বোতল, দারুণ! কী বলো? আর শীত বেশি মনে হলে তুমি গ্যাস জ্বালিয়ে দিতে পারো যে কোনো সময়।'

'ধন্যবাদ,' বলল বিলি। 'অনেক, অনেক ধন্যবাদ।' সে লক্ষ করলো বিছানার কাভার সরিয়ে রাখা হয়েছে। পরিপাটি করা বিছানা চট করে শুয়ে পড়ার জন্য তৈরি।

'তুমি এসে পড়ায় কী যে খুশি হয়েছি,' গভীর দৃষ্টি মেলে তাকে দেখতে দেখতে বললেন মহিলা। 'আমি হতাশ হতে চলেছিলাম।'

'বেশ,' উৎফুল্ল ভাবে বলল বিলি, 'আমার জন্য কোনো চিন্তা করবেন না।' সে চেয়ারের উপর তার স্যুটকেসটি রেখে সেটি খুলতে লাগলো।

'রাতে কী খাবে, বাছা? এখানে আসার আগে কিছু খেয়ে আসতে পেরেছিলে কি?'

'একদম খিদে নেই আমার, ধন্যবাদ,' বলল সে। 'খুব তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বো, কাল ভোরে উঠতে হবে আমাকে। সকালে আমার অফিসে রিপোর্টিং।'

'বেশ। তাহলে এখন বিদায় নিচ্ছি আমি, তুমি তোমার কাপড়চোপড় বের করো। তবে বিছানায় যাবার আগে একটু কি কষ্ট করে নিচে যেতে পারবে? যেয়ে যদি রেজিস্টার বইটাতে একটা সই করে দিয়ে আসতে পারতে। জানোতো দেশের আইন এটা, মানতে হবে

সবাইকে।' হাতের একটা ইশারা করে তিনি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পেছনে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

মহিলা যে একটু পাগলাটে ধরনের এটা বুঝেও বিলির কোনো দুশ্চিন্তা হলো না। মহিলাটি ক্ষতিকর কিছু নন– সে প্রশ্নই নেই – বরং দারুণ রকম দয়ালু ও উদার গোছের। তার মনে হলো ভদ্রমহিলা হয়তো যুদ্ধে তার কোনো ছেলেকে হারিয়েছেন, অথবা অমনই কিছু একটা ঘটেছে তার, আর সেই কষ্ট আজও তাকে ছেড়ে যায়নি।

কাজেই সে কয়েক মিনিট পরে স্যুটকেসের জিনিসপত্র বের করে রেখে, হাতমুখ ধুয়ে তড়তড় করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে নিচতলার বসার ঘরটিতে এলো।

বাড়িওয়ালি নেই সেখানে, তবে ফায়ার প্লেসের আগুন জ্বলছে ঔজ্জ্বল্যের সাথে, আর সেই ডাকসোন্ট কুকুরটি তখনও পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে মেঝেতে। কক্ষটি জুড়ে রয়েছে সঠিক উষ্ণতা ও তাতে বিরাজ করছে খুব আরামদায়ক এক পরিবেশ। দুহাতের পাঞ্জা একসাথে করে ঘষে সে ভাবলো, দারুণ সৌভাগ্যবান আমি। একটু বেশিই ভালো বলতে হবে ভাগ্যটা।

পিয়ানোর উপরে গেস্ট-বইটা মেলে রাখা আছে দেখতে পেলো সে। কলম বের করে সে তার নাম ঠিকানা লিখে দিলো বইটিতে। তার নামের উপরে আর কেবল দুটি নামের এন্ট্রি ছিল, দেখলো সে। আর সাধারণত সবাই যা করে সেও তাই করলো – অর্থাৎ নাম দুটো পড়তে লাগলো। একজন কার্ডিফ থেকে ক্রিস্টোফার মালহল্যান্ড, আর অপরজন গ্রেগরি ডব্লিউ. টেম্পল, ব্রিস্টল থেকে।

এটা অদ্ভুত, ভাবলো সে হঠাৎ। ক্রিস্টোফার মালহল্যান্ড। নামটা একটা ঘণ্টা বাজাচ্ছে মনের মধ্যে।

এই প্রায় অস্বাভাবিক নামটা কোথায় শুনেছে সে আগে? তার স্কুলের কোনো ছেলে? না। তার বোনের অসংখ্য বন্ধুদের কেউ? বা, বাবার কোনো বন্ধু? না, না, এর কোনোটাই না। সে আবার খোলা খাতাটার দিকে ঝুঁকে এলো।

ক্রিস্টোফার মালহল্যান্ড ২৩১ ক্যাথিড্রাল রোড, কার্ডিফ
গ্রেগরি ডব্লিউ. টেম্পল ২৭ সিকামোর ড্রাইভ, ব্রিস্টল

এতক্ষণে তার বোধ হলো দ্বিতীয় নামটাও প্রথমটার মতো অপরিচিত ঠেকছে না তার।

'গ্রেগরি টেম্পল?' স্মৃতি হাতড়াতে হাতড়াতে সশব্দে নামটা উচ্চারণ করলো সে। 'ক্রিস্টোফার মালহল্যান্ড?...'

'চমৎকার দুটো ছেলে,' পেছন থেকে একটা কণ্ঠ বলে উঠলো কথাটা। পিছনে ফিরে দেখলো বাড়িওয়ালী মস্ত একটা সিলভার ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকছেন। ট্রে-টাকে তিনি এমন ভাবে তার বুকের সামনে ধরেছেন যেন ছুটে চলা কোনো ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছেন।

'কেন যেন নামদুটো পরিচিত মনে হচ্ছে,' বলল বিলি।

'তাই নাকি? কী মজার কথা।'

'আমি প্রায় নিশ্চিত যে আগে কোথাও শুনেছি এ নাম দুটো। অদ্ভুত না? বোধহয়

কোনো খবরের কাগজে পড়েছি। এরা কি কোনো বিখ্যাত কেউ কোনোভাবে? মানে, বিখ্যাত কোনো ক্রিকেটার বা ফুটবলার, এরকম কিছু?'

'বিখ্যাত কেউ?' সোফার সামনে নিচু টেবিলটার উপর চায়ের ট্রে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন মহিলা। 'ওহ, না, আমার মনে হয় না এরা কেউ বিখ্যাত কিছু ছিল। তবে একটা বিষয় নিশ্চিত বলতে পারি যে এদের দুজনই ছিল বেজায় সুদর্শন। লম্বা, বয়সে যুবক ও দারুণ হ্যান্ডসাম, ঠিক তোমার মতো।'

আরেকবার বিলি খাতার উপর ঝুঁকলো। 'দেখুন,' তারিখের জায়গাটা দেখিয়ে বলল সে। 'শেষ এন্ট্রিটা দু'বছরের পুরনো।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়। আর ক্রিস্টোফার মালহল্যান্ডেরটা তারও একবছর আগের, অর্থাৎ আজ থেকে তিন বছরেরও বেশি আগের।'

'কপাল আমার,' মাথা ঝাঁকিয়ে বড়ো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মহিলা। 'মাথায়ই নেই আমার। সময় কিভাবে দ্রুত উড়ে পালিয়ে যায় আমাদের কাছ থেকে, তাই না মিস্টার উইলকিনস?'

'উইভার,' বলল বিলি। 'উ-ই-ভা-র।'

'ও, হ্যাঁ, তাইতো!' সোফায় বসতে বসতে বললেন তিনি। 'কী বোকা আমি, ক্ষমা করবে আমাকে। এ বয়সে এখন আমার এক কান দিয়ে কথা ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়, মিস্টার উইভার।'

'একটা জিনিস কি জানেন?' বলল বিলি। 'কিছু একটা অসাধারণ ব্যাপার এখানে রয়েছে।' 'না, বাছা, জানিনাতো।'

'মানে, যেটা হয়েছে – এই দুটো নাম, মালহল্যান্ড ও টেম্পল, দুটো নামই যে আলাদা ভাবে মনে করতে পারছি শুধু তাই না। যেভাবেই হোক, কোনো এক অদ্ভুত ভাবে এরা দুজন একজন আরেকজনের সাথে জড়িয়ে আছে। দুজনই কী ভাবে যেন একই বিষয়ে বিখ্যাত হয়ে আছে। মানে, বুঝতে পারছেন কী বলতে চাচ্ছি? ... এই ধরুন যেভাবে ডেম্পসির সাথে টানি, বা চার্চিলের সাথে রুজভেল্ট।'

'কী মজার কথা,' বললেন তিনি। 'এবার এসো, বসো আমার পাশে সোফায়, তারপর আদার বিস্কুটের সাথে চা খাও এক কাপ ঘুমুতে যাবার আগে।'

'এসবের কোনো দরকারই ছিল না,' বলল বিলি। 'আমি মোটেই এসব কিছু আশা করিনি এখন।' পিয়ানোর পাশে দাঁড়িয়ে থেকে সে ভদ্রমহিলার দিকে ভালো করে তাকালো। মহিলা তখন কাপ পিরিচ নিয়ে ব্যস্ত। সে লক্ষ করলো মহিলার ফরসা হাতদুটো দারুণ ক্ষিপ্রতার সাথে চলছে, আঙুলের নখ তার লাল।

'আমি প্রায় নিশ্চিত যে এদের কথা খবরের কাগজে দেখেছি আমি,' বলল বিলি। 'একটু পরেই মনে পড়ে যাবে আমার, নিশ্চিত।'

এর চাইতে বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা আর কী হতে পারে, একটা কিছু স্মৃতির দুয়ারে এসে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ভেতরে ঢুকছে না।

দাঁড়ান। মালহল্যান্ড ... ক্রিস্টোফার মালহল্যান্ড ... ইটনের ছাত্র ছিল না সে, যে কিনা ওয়েস্ট কাউন্টি ধরে ভ্রমণে বেরিয়ে পরে হঠাৎ ...'

'দুধ,' বলে উঠলেন মহিলা। 'আর চিনি?'

'হ্যাঁ, দিন, তারপর হঠাৎ ...'

'ইটন স্কুল,' বললেন মহিলা। 'ও, না, সেটা ঠিক নয়। মিস্টার মালহল্যান্ড যখন আমার কাছে আসে তখন সে ইটন থেকে আসেনি, এটা নিশ্চিত। সে ছিল ক্যামব্রিজ আন্ডার গ্র্যাজুয়েট। এসো এবার, আমার পাশে গরমে বসে চা টা খাও। চা প্রস্তুত তোমার।' বলে তিনি তার পাশে সোফার উপর চাপড় মেরে তাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। হাসি মুখে তিনি বিলির অপেক্ষা করছেন।

সে এগিয়ে এসে সোফার এক প্রান্তে বসলো। মহিলা চায়ের কাপ তার সামনে টেবিলের কাছে ঠেলে দিলেন।

'দেখ এবার,' বললেন তিনি। 'খুব আরামের না বসার জায়গাটা, কি বলো?'

চায়ের কাপে চুমুক দিল বিলি, মহিলাও তাই করলেন। আধা মিনিটের মতো সময় কেউ আর কোনো কথা বলল না। বিলি অবশ্য বুঝতে পারছে ভদ্রমহিলা তাকে দেখছেন। মহিলা তার দিকে আধা ঘুরে বসে আছেন, আর তার চশমার রিমের উপর দিয়ে তিনি বিলির মুখের দিকে চেয়ে রয়েছেন। থেকে থেকে সে একটা কেমন যেন অদ্ভুত গন্ধ টের পাচ্ছে নাকে, বোঝা যাচ্ছে গন্ধটা ভদ্রমহিলার শরীর থেকেই আসছে। গন্ধটা খুব বাজে তা নয়। অনেকটা যেন, আসলে সে ঠিক নিঃসন্দেহ নয় কিসের। আখরোটের আচার? নতুন চামড়ার গন্ধ? বা কোনো হাসপাতালের বারান্দা ধরে হাঁটলে যে ধরনের গন্ধ নাকে এসে লাগে সে রকম কিছু?

'মিস্টার মালহল্যান্ড বড়ো চা পাগলা ছিল,' বললেন মহিলাটি।

'বাছা, মালহল্যান্ডের মতো এতো চা খেতে আর কাউকে দেখিনি জীবনে।'

'আমার মনে হয় সে সম্প্রতি আপনার গেস্ট হাউস ছেড়েছে,' বলল বিলি। নাম দুটোর ব্যাপারে সে এখনও তার মাথা হাতড়ে বেড়াচ্ছে। সে এখন পুরোপুরিই নিঃসন্দেহ যে এদের নাম সে খবরের কাগজে দেখেছে– শিরোনাম হিসেবে।

'ছেড়েছে?' ভ্রু বেঁকিয়ে বললেন মহিলা। 'কিন্তু, বাছা, সে তো ছেড়ে যায়নি কখনও। সে এখনও এখানে আছে। মিস্টার টেম্পলও। তিন তলায় দুজন এক সাথে।'

বিলি আস্তে করে তার কাপটা নামিয়ে আনলো টেবিলের উপর, তারপর তাকিয়ে থাকলো বাড়িওয়ালির দিকে। জবাবে তিনি তার উদ্দেশ্যে হাসলেন, পরে তার ধবধবা একটা সাদা হাত প্রসারিত করে বিলির হাঁটুর উপর হালকা চাপড় মারলেন।

'বয়স কতো তোমার, বাছা?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'সতেরো।'

'সতেরো!' উৎসাহের সাথে একটু চেঁচিয়ে বলে উঠলেন তিনি। 'বাহ্, এটা একেবারে সঠিক বয়স! মিস্টার মালহল্যান্ডেরও বয়স সতেরোই ছিল। তবে মনে হয় তোমার থেকে একটু খাটো ছিল সে – মনে হয় না, আসলে খাটোই ছিল। আর ওর দাঁতগুলো এতো সাদা

ছিল না। তুমি যে অসম্ভব সুন্দর দাঁতের অধিকারী সেটা কি তোমার জানা আছে মিস্টার উইভার?'

'দেখতে যতটা সুন্দর আসলে অতটা নয়,' বলল বিলি।

'বেশিরভাগেরই পেছনদিকটায় ফিলিং করা।'

'মিস্টার টেম্পল অবশ্য কিছুটা বয়স্ক ছিল,' তার শেষের কথায় কোনো পাত্তা না দিয়ে বলে যেতে থাকলেন মহিলা। 'তার বয়স ছিল আটাশ বছর। অবশ্য সে নিজে থেকে আমাকে না বললে কোনোদিন আমি তা বুঝতে পারতাম না। সারা শরীরে তার কোনো দাগ ছিল না।'

'কী বললেন?'

'তার ত্বক ছিল ঠিক শিশুদের মতো।'

এরপর দুজনই চুপচাপ হয়ে রইলো কতক্ষণ। বিলি তার চায়ের কাপ তুলে নিয়ে একটা চুমুক দিলো, তারপর তা আবার সাবধানে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলো। সে আশা করছিল ভদ্রমহিলা অন্য কোনো বিষয়ে আলাপ করুক। কিন্তু মনে হলো তিনি তখন এক ধরনের ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছেন। সে বসে থেকে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো দূরে সোজা ঘরের এক কোণে।

'ওই যে কাকাতুয়াটা,' অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠলো সে। 'জানেন? রাস্তা থেকে জানালার ভেতর দিয়ে দেখে আমি একেবারে বোকা বনে গিয়েছিলাম। আমি বাজি ধরতে পারতাম যে ওটা জ্যান্ত।'

'আফসোস, এখন আর নয়।'

'অসম্ভব দক্ষতার সাথে কাজটা করা হয়েছে,' বলল সে। 'দেখে মোটেই মনে হয় না যে পাখিটা মৃত। কে করেছে কাজটা?'

'আমি।'

'আপনি করেছেন?'

'নিশ্চয়,' বললেন মহিলা। 'আমার বেসিলকে দেখেছো তুমি?'

তিনি ইশারায় সারাক্ষণ আগুনের সামনে মেঝেতে কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকা ডাকসোন্টটির দিকে দেখিয়ে দিলেন। হঠাৎ বিলির খেয়াল হলো যে কাকাতুয়াটির মতোই এই কুকুরটাও গোটা সময় ধরে একইভাবে একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে। সে একটা হাত বাড়িয়ে কুকুরটার পিঠে সাবধানে ধরে দেখলো। ঠান্ডা ও শক্ত শরীর। আঙুল দিয়ে সে এবার লোম সরালো একটু, লোমের নিচে চামড়া শুকিয়ে কালচে ধূসর। চমৎকার ভাবে সংরক্ষিত।

'কী অসাধারণ! বলল সে। 'অবিশ্বাস্য রকম চমকপ্রদ নিখুঁত কাজ।' কুকুরটির কাছ থেকে সরে এসে সে সোফায় বসে থাকা ছোটোখাটো মহিলাটির দিকে গভীর মুগ্ধতা নিয়ে তাকালো। 'এ নিশ্চয় দারুণ কঠিন এক কাজ।'

'মোটেই তা নয়,' বললেন মহিলাটি। 'আমার পেটগুলো মরে গেলে আমি নিজেই ওগুলোকে স্টাফ করে রেখে দেই। আরেক কাপ চা দেবো তোমাকে?'

'না, ধন্যবাদ, আর দরকার নেই,' বলল বিলি। চায়ে কেমন একটা তিতকুটে ভাব, বোধহয় আমন্ড। ওই চা আরেকবার খাবার কোনো মানে হয় না।

রেজিস্টার বইটাতে সই করেছো তো, তাই না?'

'ও, হ্যাঁ, করেছি।'

'খুব ভালো করেছো। কারণ, তাহলে পরে আমি তোমার নাম ভুলে গেলে নিচে এসে বই থেকে জেনে নিতে পারবো। বলতে গেলে প্রতিদিন আমি ওটা করি, মিস্টার মালহল্যান্ড এবং মিস্টার ... মিস্টার ...'

'টেম্পল,' বলে দিল বিলি। 'গ্রেগরি টেম্পল। জিজ্ঞেস করছি বলে কিছু মনে করবেন না – গত দু'তিন বছরে এই দুজন ছাড়া আপনি আর কোনো গেস্ট পাননি?'

তার চায়ের কাপটা এক হাতে উঁচু করে ধরে, মাথাটা তার বাঁয়ে একটু কাত করে আড় চোখে বিলির দিকে চেয়ে তিনি তাকে আরেকটা হাসি উপহার দিলেন।

'না, বাছা আমার,' বললেন তিনি। 'তুমি ছাড়া আর কেউ না।'

(মূল গল্পের নাম-THE LANDLADY, লেখক-ROALD DAHL)

বিভ্রম

মো. মহসীন
গ্রুপ জিএম, অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

সকালে মোবাইল ফোনের রিংটোনে ঘুমটা ভেঙে গেলো, তাকিয়ে দেখি আমার ড্রাইভার মিজানের ফোন। তখন মাত্র সকাল সাতটা। কাল রাতে এমনিতেই দেরিতে ঘুমিয়েছিলাম। এত সকালে ঘুম ভেঙে যাওয়াতে মেজাজটা বিগড়ে গেলো। আমি ওকে সকাল আটটায় আসতে বলেছিলাম। ঘুম ঘুম চোখে ফোনটা ধরার পর মিজান বলল, তার মা ভোরে স্ট্রোক করেছে, হাসপাতালে নিয়ে এসেছে। শুনেই মনটা খারাপ লাগল। মিজান আমার এলাকার ছেলে, ওর বাবা নেই, মা-ই একমাত্র সম্বল। অনেকদিন ধরে আমার গাড়ি চালায়, খুব বিশ্বস্ত। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'টাকা পয়সা নিয়ে একদম চিন্তা করবে না, যা লাগে আমাকে বলবে।'

– কিন্তু স্যার, আপনি নরসিংদী-বেলাব সাইটে যাবেন কী করে? আজকে তো আপনার চেয়ারম্যান স্যারের সাইট ভিজিটে আসার কথা।

– এজন্য তোমার চিন্তা করতে হবে না। আমি নিজেই ড্রাইভ করে যাবো।

যেহেতু অফিসের প্রজেক্টগুলোর ইনচার্জ আমি, অনেক দায়িত্ব সামলাতে হয়। এর মধ্যে আমাদের কোম্পানির চেয়ারম্যান 'জলিল সাহেব' তার গ্রামের বাড়ি নরসিংদীর বেলাবোতে একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে, সেখানে একটি হাসপাতাল, এতিমখানা এবং বৃদ্ধাশ্রম করছে অসহায় মানুষদের জন্য। চেয়ারম্যান স্যার অনেক ভালো মনের একজন মানুষ। আজ কাজের অগ্রগতি দেখতে দুপুরের পর আসবেন। তাই নিজেই ড্রাইভ করে সকাল দশটার মধ্যে প্রজেক্টে পৌঁছে গেলাম। চেয়ারম্যান স্যার বিকেল পাঁচটার দিকে আসলেন, তাকে পুরো প্রজেক্ট ঘোরানোর পর অন্যান্য কাজ গুছাতে গুছাতে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিলো, বেরোতে বেরোতে রাত আটটা, এত রাত হবে বুঝিনি। সব গুছিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। গ্রামের ভেতর দিয়ে পিচ ঢালা রাস্তা। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মানুষের বসতি এদিকটায় খুব একটা নেই বললেই চলে। ক্যাসেট প্লেয়ারে 'ব্রায়ান অ্যাডামস-এর সামার অব সিক্সটি নাইন' গানটা ছাড়লাম। কিছুদূর আসার পর হঠাৎ ঘটঘট আওয়াজ করে গাড়িটা রাস্তায় থেমে গেলো। কিছুতেই স্টার্ট হচ্ছে না। মোবাইল বের করলাম, মিজানকে ফোন করবো বলে, কিন্তু তাকিয়ে দেখি চার্জ নেই। সারাদিন কাজের প্রেসারে, চার্জ দেয়ার কথা মনেই ছিল না। ভীষণ বিপদে পড়ে গেলাম। আশেপাশে কোন মানুষের নিশানাও দেখছি না।

গাড়ির দরজাটা লক করে বের হলাম। ভীষণ অন্ধকার, মাঝে মাঝে জোনাকি পোকার টিমটিম আলো জ্বলছে। আকাশে দূরের উজ্জ্বল তারাগুলো যদিও জ্বলজ্বল করছে, তারপরও আশেপাশে ভালো করে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। এমন সময়ে আমার কোনো এক মনীষীর উক্তি মনে পড়ল, 'আমি রাতকে ভালোবাসি কেননা অন্ধকার না হলে কখনোই আমি তারাগুলো দেখতে পাই না।' আমারও রাত খুব ভালো লাগে, কিন্তু আজকে মনে হচ্ছে রাতের সাথে ভয়ের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এদিক সেদিক তাকানোর পর দেখলাম, সামনে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে, সেখানে টিমটিম করে আলো জ্বলছে। মনে একটু স্বস্তি পেলাম। কিন্তু বাড়ির সামনের সদর দরজায় কোন লাইটের আলো দেখতে পেলাম না। মনে হয় বিদ্যুৎ চলে গেছে। আজকে প্রজেক্টের অফিসেও কয়েকবার বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিলো, কিন্তু জেনারেটর ভাড়া করে আনা হয়েছিলো বলে সামাল দিতে পেরেছি।

বিশাল বাড়ি, ঠিক জমিদার বাড়ির মতো। দরজায় অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর এক মধ্যবয়সী লোক দরজা খুলল, হাতে একটা হারিকেন। তাকে দেখেই হঠাৎ ভয়ে শরীরটা শিউরে উঠল। মুখটা কেমন যেন বিভৎস প্রকৃতির। কিন্ত হারিকেনটা সে তার মুখের উপরে ধরার পর বুঝতে পারলাম, ওটা বসন্তের দাগ, যে কারণে মুখটা অমন দেখাচ্ছে। প্রথম দেখাতে যে কেউ ভয় পেয়ে যাবে। যাই হোক, লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা আশেপাশের কোনো গাড়ির গ্যারেজ আছে? আমার গাড়িটা হঠাৎ নষ্ট হয়ে গিয়েছে।'
উনি বললেন, 'জেলা সদরে আছে, কিন্ত এত রাতে খোলা পাইবেন না।'
– জেলা সদর এখান থেকে কতদূর হতে পারে?
– এই ধরেন ১০-১৫ মাইল।
– আচ্ছা কোনো গাড়ি, রিক্সা বা অটোরিক্সা পাওয়া যাবে?
– জ্বি, না। এখানে রাত ৮টার পরে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে।
আমি উপায়ান্তর না দেখে বললাম, 'আপনাদের কাছে কোনো ফোন আছে? আমি একটা কল করবো। আমার মোবাইলের চার্জ চলে গিয়েছে।'
– আমরা গাঁ-গ্রামের মানুষ, ফোন কই পামু?
আমি তখন রীতিমতো ঘামছি, মাথায় কিছুই কাজ করছে না।
– আচ্ছা আশেপাশের বাজারে রাতে থাকার জন্য কোন হোটেল পাওয়া যাবে?
– এই গ্রামে হোটেল পাইবেন কই? সদরে গেলে পাইতে পারেন।
– সদরে! সেতো প্রায় দশ-পনের মাইল হবে বললেন।
– তাতো হইবোই, হাইটা গেলে, ঘণ্টা দেড়েক এর মতো লাগবো।
আমিতো মহা চিন্তায় পড়ে গেলাম, এতদূরে হেঁটে যাওয়া, তার উপর গ্রামের রাস্তাও ঠিকভাবে চিনি না। এদিকে গাড়িটা নিয়ে কী করবো, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।
আমি সংকোচ নিয়ে বললাম– আমাকে একটু রাতে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন? খুব বিপদে পড়ে গেছি। গাড়িটাও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এত রাতে কোথায় যাবো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

লোকটি এমনভাবে আমার দিকে তাকাল, ভয় পেয়ে গেলাম। তার চোখগুলো কেমন যেন লাল, তা হারিকেনের আলোতে স্পষ্ট জ্বলছিলো।
তারপর হঠাৎ বলল, 'আমি একটু তালুকদার সাহেবকে জিজ্ঞেস করে আসি।'
আমি বললাম, 'তালুকদার সাহেব!'
– জ্বি, এই বাড়ির কর্তা। ওনার বড় ভাই সফিক তালুকদার মারা যাবার পর, এখন তার ছোট ভাই রহমান তালুকদার সবকিছু দেখাশুনা করেন। বলেই সে ভেতরে চলে গেলো। আহা, উনার নামটাই তো জিজ্ঞেস করা হলো না, মনে হয় তালুকদার সাহেবের কেয়ারটেকার হবে। উনি ভেতরে চলে যাবার পর ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে দরজায় দাঁড়িয়ে আছি, কেমন যেন গা ছমছম করা পরিবেশ। হঠাৎ একটা ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা শরীর ছুঁয়ে চলে গেলো। ভেতরে যদিও একটু একটু ভয় কাজ করছে, তবে আমি মানসিকভাবে যথেষ্ট সাহসী, একথা পরিচিত সবাই জানে। এরমধ্যে হঠাৎ বাজ পড়ার শব্দে চমকে উঠলাম। বুঝতে পারলাম বৃষ্টি আসবে। বলতে না বলতে ঝুপ করে বৃষ্টিও নেমে গেলো। চারিদিকে উথাল-পাথাল বাতাস। যদিও আমি বারান্দায় দাঁড়ানো, তবুও বৃষ্টির ঝাপটা মুখে, শরীরে এসে পড়ছে। এদিকে অনেকক্ষণ সময় হয়ে গেলো, ভেতর থেকে কারো কোনো সাড়াশব্দও পাচ্ছি না। খানিকক্ষণ পর গলার আওয়াজ পেলাম, দেখি কেয়ারটেকারের সাথে একজন কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক দরজায় এসে দাঁড়াল। পরনে সাদা একটা পাঞ্জাবি, কাঁধে দামি একটা শাল। বয়স আনুমানিক ৬০–৬৫ বছর হবে। বুঝলাম ইনিই তালুকদার সাহেব। আমি সালাম দিলাম। বেশ ভদ্রভাবে তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন। তারপর বললেন, 'আপনার গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছে? কোনো চিন্তা করবেন না। রাতে আমার এখানে থেকে যান, সকালে আমি লোক পাঠিয়ে সদর থেকে মিস্ত্রি ডেকে নিয়ে আসবো। কালু, উনার জন্য জামাকাপড়, খাওয়ার এবং শোবার ব্যবস্থা কর। আর উনাকে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে না রেখে ভেতরে বসতে বলিসনি কেন, দেখছিস না একদম ভিজে গেছে, তোর আক্কেল-বুদ্ধি যে কবে হবে!'
বুঝলাম কেয়ারটেকারের নাম কালু।
ভদ্রলোক আমাকে ভেতরে যেতে অনুরোধ করলেন আর বললেন,
– কালু, বাবুকে গেস্ট রুমে নিয়ে যা, আমি ওনার জন্য গোসলের গরম পানি এবং খানাপিনার ব্যবস্থা করি।
বাথরুম থেকে গোসল ছেড়ে বের হয়ে দেখি, রুমে খাবারদাবার রেডি। তালুকদার সাহেব নিজে বসে পুরো খাবারের তত্ত্বাবধান করলেন। তার আতিথেয়তায় আমি পুরোপুরি মুগ্ধ। এত তাড়াতাড়ি কয়েক প্রকারের মেন্যুর আয়োজন আমাকে অবাক করে দিলো। খাবারদাবার পর যথারীতি বিছানায় চলে গেলাম। সারাদিনের ক্লান্তিতে কখন যে ঘুমিয়ে গিয়েছি, টের পাইনি। হঠাৎ খট করে একটা আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেলো। তাকিয়ে দেখি দরজায় ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এই বাড়িতে আর কে কে থাকে, কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করা হয়নি, অশোভনীয় হবে বলে। তবে এতটুকু বুঝতে পেরেছি বাড়িতে মেয়ে মানুষ আছে, নইলে এত তাড়াতাড়ি এত মজার মজার

রান্না কী আর হতো!
জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, বাইরে ভরা পূর্ণিমা। রুপালি চাঁদের মায়াভরা জোৎস্নার আবেশে, দিনের মতো জোৎস্নার আলোয় চারদিক থইথই করছে, তার অনেকখানি জানালা দিয়ে এই ঘরেও পড়েছে।
এবার দরজার দিকে তাকিয়ে বললাম, কে ওখানে?
কোনো উত্তর নেই। তেমনি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে।
আমি কী বলব বা কী করা উচিৎ, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না।
রাতে শোবার সময়, কালুকে আমার দরজার সামনে বিছানা পেতে শুতে দেখেছিলাম। তালুকদার সাহেবও কালুকে বারবার ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছিলেন, দরজার সামনে থেকে একদম নড়বি না, বাবুর যা যা লাগে, ঠিকভাবে খেয়াল করবি। আজ রাতে তোকে যদি ছাইপাশ খেতে দেখি, তবে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

দরজার সামনে বিছানা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কালুকে দেখতে পাচ্ছি না। বাইরে হঠাৎ জোরে বাতাস শুরু হয়ে যাওয়ার শন-শন শব্দ শোনা যাচ্ছে, মনে হয় বৃষ্টি আসবে। কিন্ত জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি এখনও ঝকঝকে পূর্ণিমার আলো। কেমন যেন খটকা লাগছে সবকিছু। পরক্ষণেই দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটা হঠাৎ কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। কিন্তু বাতাসে বারবার দরজার বাড়ি খাওয়ার শব্দ বাড়তেই লাগলো। অথচ সেটা যে আমার ঘরের দরজা নয় তা দেখেই বুঝতে পারছি। সবকিছু ভুলে আবার ঘুমুতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু বিরক্তিকর কটকট আওয়াজে দু'চোখের পাতা আর এক করতে পারছি না। কৌতূহলবশত বিছানা থেকে উঠে দরজার বাইরে এসে দেখি, আমার রুমের দরজার ডান পাশেই আরও একটি দরজা, মনে হয় বাড়ির পিছনে যাওয়ার রাস্তা, সেটা খোলা। আর তাই বাতাসে দরজাটা একবার এদিকে তো আরেকবার ওদিকে যাচ্ছে, আর কটকট করে ভীষণ শব্দ করছে। আমি ডিসিশান নিলাম, দরজাটা বন্ধ করার। প্রথম কারণ হলো প্রচণ্ড আওয়াজ হচ্ছিলো, দ্বিতীয়ত, শুনেছি গাঁ-গ্রামে প্রচুর চুরি হয়। তাই প্রটেকশান হিসেবে গেলাম দরজাটা বন্ধ করতে। দরজার সামনে গিয়ে দেখি, বাইরে উঠানে মেয়েটি দাঁড়িয়ে। পূর্ণিমার আলোতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, দরজার দিকে মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, পেছনে একটা পুকুর ঘাট। হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে কয়েকবার বিজলি চমকালো, তার পুরো চেহারাটা দেখতে পেলাম। মনে হলো অতি পরিচিত, খুব কাছের কেউ। আমি তাকে চিনি। হঠাৎ পুকুর ঘাটের দিকে হাঁটা শুরু করলো। ভালো করে লক্ষ করে দেখি হাতে একটি মাটির কলসি, তা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। শুনেছি গ্রামে-গঞ্জে মেয়েরা পুকুরে আত্মহত্যা করে। এতক্ষণ আমার হিতাহিত বোধ কাজ করছিলো না, হঠাৎ সম্বিত ফিরে ফেলাম। দেরি না করে এক দৌড়ে রুম থেকে হারিকেনটা নিয়ে এসে, মেয়েটির সামনে দাঁড়ালাম এবং দ্রুতগতিতে তার হাতে থেকে কলসিটা কেড়ে নিয়ে বললাম, 'আপনি কী করছেন?' তার মুখের দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে আমিতো অবাক। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। এতো দেখি আমার ইউনিভার্সিটির ক্লাসমেট 'নীলা।' কিন্তু পরক্ষণেই এই

ভেবে কনফিউজড হলাম যে, নীলা এখানে আসবে কী করে!
তারপরও আমি সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা আপনার নাম নীলা?'
– হ্যাঁ আসিফ, আমি নীলা।
শুনে আমিতো অবাক! জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি এখানে!'
– এটা আমার শ্বশুরবাড়ি।
– তোমার শ্বশুরবাড়ি! আর এত রাতে কলসি নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? তোমার হাসব্যান্ড কোথায়!
– ওর জন্যই তো পানি আনতে যাচ্ছি। ও আগুনে পুড়ে কষ্ট পাচ্ছে, ওকে পানি দিতে হবে।
বলেই করে কান্না শুরু করে দিলো।
– আগুনে পুড়ে কষ্ট পাচ্ছে মানে, ঠিক বুঝতে পারলাম না।
– ওরা আমার স্বামীকে মেরে, মেঝেতে পুঁতে তারপর ঐ ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।
– মেরে ফেলেছে! কে মেরেছে, কোথায় আগুন?
– ওর চাচা।
বলেই অঝোরে কান্না শুরু করে দিলো। আমি ঠিক কি করবো, বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ওর কান্নার আওয়াজে বাড়ির ভেতরের লোক চলে আসলে একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। এত রাতে গ্রামের একটা বাড়ির বউয়ের সাথে, বাইরের একজন লোকের কথা বলা দেখলে ভুল বুঝতে পারে।
বিস্ময় আর উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'উনার চাচা মানে!'
– ঐ রহমান তালুকদার, যে তোমাকে এই বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে। সেইতো খুনি। আমার শ্বশুর আর শ্বাশুরিকে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে। এরপর মুরাদকে মেরে সবাইকে ঘরের মেঝেতে পুঁতে রেখেছে। আমাকেও যেকেনো মুহূর্তে মেরে ফেলবে।
– রহমান তালুকদার এরকম করলেন কেন, সম্পত্তির জন্য?
– হ্যাঁ সম্পত্তির জন্য, তার আশা ছিলো আমার হাসব্যান্ড মুরাদের সাথে তার মেয়ের বিয়ে দিয়ে সবকিছুর হর্তাকর্তা হবেন। কিন্তু মুরাদ আমাকে বিয়ে করাতে তার সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ল আমাদের উপর।
আমারতো পুরো শরীরে ভয়ের শীতল স্রোত বয়ে গেলো। তালুকদার সাহেবকে তো অতি ভদ্র এবং অমায়িক মনে হলো।
– আমি বললাম তুমি কী করে সিওর হলে, তিনিই সবাইকে মেরেছেন?
– আমি নিজের চোখে সব দেখেছি। আসিফ তুমি যেভাবে পারো, পুলিশকে সব খুলে বলো, আর এখানে বেশিক্ষণ থেকো না, তাহলে তোমাকেও মেরে ফেলবে। তোমাকে এখানে দেখে আমিও অবাক হয়েছি। প্লিস কিছু একটা করো। আমাদের অনেক বিপদ। আমাকে ওরা বাঁচতে দেবে না। আমি আজ রাতে ভয়ে একটুও ঘুমাতে পারছি না।
ওর আকুতি শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো। কী করবো, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না।
আমি বললাম, 'তুমি পুলিশের কাছে গেলে না কেন?'
আমি যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তালুকদারের লোকের পাহারা চারদিকে, তাই ধরা পড়ে

গিয়েছিলাম।
হঠাৎ কারো পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়ে, গাছের আড়ালে লুকিয়ে গেলাম। দেখলাম নেশায় টলতে টলতে কালু বাড়ির পিছনের রাস্তা দিয়ে ঢুকছে। কিন্তু বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে না ঢুকে, বাইরের বারান্দায় শুয়ে গেল, কতক্ষণ আপন মনে কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে গেলো।
গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে দেখি, নীলা নেই। হয়তো কালুকে দেখতে পেয়ে ভেতরে চলে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়লাম, আর ভাবতে লাগলাম, কী করা যায়! ইউনিভার্সিটির পুরোনো টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো মনে ভেসে উঠল। হঠাৎ করে পড়া অবস্থায়ই নীলা বিয়ে করে ফেলেছিল আমাদের ডিপার্টমেন্টেরই এক ক্লাস সিনিয়র মুরাদ ভাইকে। আমার মতো সবাই ভীষণ অবাক হয়েছিল সেদিন। অথচ মুরাদ ভাইয়ের সাথে ওকে কখনও তেমন ঘনিষ্ঠ হতে দেখিনি। বরং আমাদের গ্রুপের সাথেই ও ভীষণ ঘনিষ্ঠ ছিল, স্পেশালি আমার ভীষণ ভালো বন্ধু ছিল। অনেকে এ নিয়ে একটু কানাঘুষা করত, কিন্তু নীলা এগুলো পাত্তাই দিত না।

এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে গেছি টেরও পাইনি। সকালের রোদের আলো মুখে পড়াতে ঘুমটা ভেঙে গেলো। তাকিয়ে দেখি, দু-তিনজন বাচ্চা গভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেলাম। দেখি আমি একটা পোড়াবাড়ির ভিটেতে শুয়ে আছি। চারিদিকে জঙ্গল। আমিতো অবাক। ভাবছি এখানে আসলাম কী করে? উঠে দাঁড়ালাম, হঠাৎ গাড়িটার কথা মনে হলো, তাকিয়ে দেখি দূরে আমার গাড়িটা দেখা যাচ্ছে। চারিদিকে মোটামুটি মানুষের জটলা। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কোন জায়গা?'
– তালুকদার নগর।
আমি তখন বললাম, 'তালুকদার বাড়ি কোনটা?'
একজন লোক বললেন, 'আপনি যেখানে শুয়েছিলেন, হেইডা একসময় তালুকদার বাড়ি আছিলো, ৭-৮ বছর আগে আগুনে পুইড়া গেছিল। কেউ বাঁচে নাই।'
আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'কেউ বাঁচেনি!'
– শুধু রহমান তালুকদার, তার স্ত্রী এবং মেয়ে বাঁচছে। তিনি সেদিন সদরে গেছিলেন, উনার স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে ডাক্তার দেখাইতে, তো দেরি হয়ে যাওয়াতে সেদিন আর বাড়িতে আসেন নাই। উনার একজন আত্মীয়ের বাড়িতে নরসিংদী সদরে হেই রাতে থাইকা গেছিল, হেজন্য বাঁইচা গেছে।
– এখন তারা কোথায় থাকে?
– এইতো দুলালপুর বাজারের কাছে, নতুন বাড়িতে।
– এখান থেকে কতদূর?
– পাঁচ মিনিটের রাস্তা হইবো।
মাথাব্যাথার যন্ত্রণায় ঠিকভাবে দাঁড়াতে পারছিলাম না।
– আচ্ছা, এখান থেকে থানা কতদূর হবে?

– ঐতো দুলালগঞ্জ বাজারেরই পাশে।
– রিক্সা, গাড়ি কিছু পাওয়া যাবে?
– হ্যাঁ স্যার, রিক্সা পাওয়া যাইবো।
একজন লোক রিক্সা ঠিক করে দিলেন। আমি রিক্সায় চড়ে বসলাম। বয়স্ক রিক্সাওয়ালা। নাম জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, আবদুল মোতালেব। মোতালেব উৎসুক হয়ে বললেন, 'আপনি পোড়াবাড়িতে শুয়েছিলেন ক্যান, রাতে কি জ্বিন-ভূত ধরছিল?'
বললাম, 'রাতে গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিলো, তাই তালুকদার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। ওরা বেশ ভালো মানুষ। আমাকে খুব যত্ন করলো, খাওয়ালো। কিন্তু এখনতো কিছুই বুঝতে পারছি না।'
– তালুকদারের বাড়িতে থাকছেন, সেটা কী কইরে সম্ভব! এইবাড়ি তো পুরাই ছাড়া বাড়ি। শুনছি সফিক তালুকদার, তার স্ত্রী, ছেলে এবং ছেলের বউ আর কাজের লোক কালুসহ সবাই আগুনে পুইড়া ছাই হইয়া গেছে। তা প্রায় ৭-৮ বছর হইল। বুঝছি আপনেরে জ্বিনে আছর করছিলো। জ্বিন-ভূতের ভয়ে এ বাড়ির আশেপাশে কেউ যায় না। তবে রহমান তালুকদার মাঝেমধ্যে লোকবল নিয়ে আইসা চারপাশের বন-জঙ্গল সাফ কইরা যান। ভাইকে সে খুব ভালবাসতো। এখানে আসলে তাদের জন্য খুব কান্নাকাটি করেন তিনি।

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। গত রাতে আমার গাড়ি খারাপ হলো, তালুকদার বাড়িতে আশ্রয় নিলাম, রাতে ঘুমালাম, নীলার সাথে দেখা হলো। রহমান তালুকদার নিজে আমাকে আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু এখন মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। আমি বেলাব থানায় পৌঁছে থানার দারোগার সাথে দেখা করলাম। ভদ্রলোক মনোযোগ দিয়ে আমার সব কথা শুনলেন। তারপর বললেন, 'বাড়িতে গিয়ে রেস্ট নেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।'
– জ্বি, রেস্ট নেবো! ঠিক বুঝতে পারলাম না।
– আজ থেকে ৭-৮ বছর আগে এই বাড়িতে আগুন লেগে সবাই মারা গিয়েছিলো। রান্নাঘর থেকে আগুনটা লেগেছিলো, পুলিশ তদন্ত করে সন্দেহ করার মতো কিছু পায়নি।
আমি বললাম, 'দেখুন আগুন লাগেনি, আগুন লাগানো হয়েছিলো। ওদের সবাইকে বিষ খাইয়ে, তারপর মেঝেতে পুঁতে, পুরো বাড়িতে আগুন লাগিয়ে সব প্রমাণ গায়েব করা হয়েছে। আপনি মেঝের কংক্রিট ভাঙ্গার ব্যবস্থা করেন, তাহলে সব খোলাসা হয়ে যাবে। নীলা আমাকে নিজে বলেছে।'
– নীলা!
– জ্বি, সফিক তালুকদারের বড় ছেলের বউ।
– কী বলছেন! যতদূর জানি উনিওতো মারা গেছেন। দেখুন আসিফ সাহেব, আমার মনে হয়, আপনার গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়াতে সাহায্যের জন্য এদিক সেদিক ছুটোছুটি করার পর, ওই পোড়াবাড়ির ঢিবিতে বসে রেস্ট নিতে গিয়ে ক্লান্তিতে আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আগে হয়তো কারো কাছে গল্পটা শুনেছিলেন তাই অবচেতন মনে ওটা আপনার মস্তিষ্কে ঘোরাফেরা করছিলো, সেটা এক ধরনের স্বপ্ন বা ইলিউশন। আর হয়তোবা ওটা জ্বিন-ভূতের কারসাজি।

লোকমুখে শুনেছি ওই বাড়িতে এখন জ্বিন-ভূতের আস্তানা হয়ে গেছে। হতে পারে, পুরোনো পরিত্যক্ত বাড়ি, কেউতো ওখানে থাকে না।

– জ্বি না। এটা আমি কারো কাছে শুনিনি, তাছাড়া এটা যে নীলার শ্বশুরবাড়ি সেটাতো আগে আমি জানতাম না।

– আচ্ছা ঠিক আছে, হয়তো এটা কাকতালীয়ভাবে মিলে গেছে। আপনি বাসায় যান, ভালো করে আরাম করেন, তারপর না হয় বিকেলে এসে এককাপ চা খেয়ে যাবেন, ততক্ষণে আপনার ব্রেন ঠিক হয়ে যাবে। এটা অনেক সময় হয়।

আমি বুঝলাম, ওনাকে এভাবে বলে কোন কাজ হবে না।

হঠাৎ মনে হলো, আমাদের ক্লাসমেট বন্ধু দিদারের কথা। ও এখন পুলিশের এসপি। তাছাড়া একই ক্লাসে পড়ার সুবাদে নীলার সাথে ওরও ঘনিষ্ঠতা ছিলো, এবং সে নীলার প্রতি ভীষণ দুর্বলও ছিলো। কিন্তু সাহস করে কখনও নীলাকে বলতে পারেনি, বন্ধুত্ব নষ্ট হবে বলে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলাম, ওকে ফোন করে সব খুলে বলার, যাতে পুলিশ থেকে সহযোগিতা পাই। দারোগা সাহেবকে বললাম, 'আপনার ফোনটা একটু দেয়া যাবে, একটা কল করব। আমার ফোনের চার্জ শেষ হয়ে গেছে।' ওনাকে ভদ্রলোকই মনে হলো, উনি মোবাইলটা আমার হাতে দিলেন কল করার জন্য।

যাইহোক, অনেকক্ষণ রিং বাজার পর, বন্ধু দিদার ধরলো। সব শুনে সেতো অবাক। আমাকে বলল, 'তুই ভুল বলছিস না তো?'

আমি বললাম, 'সত্যি বলছি। তাছাড়া তুই বল, আমি তো আগে জানতাম না। এই পোড়াবাড়িটি নীলার শ্বশুরবাড়ি। তারপর দেখ, নীলা যা যা বললো সবইতো মিলে গেছে। ওদের বাড়ি সত্যি আগুনে পুড়ে গেছে। নীলা নিজের মুখে বলেছে, ওর শ্বশুর-শ্বাশুরি আর হাসব্যান্ডকে মেরে মেঝেতে গর্ত করে চাপা দিয়ে রেখেছে। তারপর বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে সব প্রমাণপত্র মোছার জন্য। কিন্তু এখন শুনছি নীলাও মারা গেছে সেই রাতে। আমার সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে দিদার। নীলাদের সাথে একটা কিছু যে হয়েছে এটা সত্যি। তুই এক কাজ কর, বেলাব থানায় বলে দে, অন্তত ফ্লোরটা ভেঙে দেখতে। তাতে তো সন্দেহটা দূর হবে। আর যদি সত্যি নীলাও মারা যেয়ে থাকে, তাহলে তার আত্মা শান্তি পাবে।'

দিদার বলল, 'দেখ আমি এমনি বললেতো হবে না, তার জন্য একটা প্রসিডিউর আছে।'

বললাম, 'দেখ একসময় তুই নিজেও নীলার জন্য পাগল ছিলি। এখন সব ভুলে গেলি? তার জন্য তোর কোনো দায়বদ্ধতা নেই?'

– না না, তা বলছি না, তুই ভুল বুঝছিস। আমি বলতে চাচ্ছি, অনেকদিনের পুরোনো কেইস, এটাকে আবার প্রসিড করতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তোর এসব বুঝতে হবে না। এটা আমাদের ইন্টারনাল ডিপার্টমেন্টের কাজ, তুই অপেক্ষা কর, আমি দেখছি।

আমি দারোগা সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে, তার কক্ষের বাইরে লম্বা কাঠের বেঞ্চে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ওসির দরজার বাইরের নেমপ্লেটে এতক্ষণে খেয়াল করলাম, ভদ্রলোকের নাম 'আবদুল মজিদ।'

অনেকক্ষণ পর, থানার দারোগা মজিদ সাহেব আমার খোঁজ করলেন।
তার রুমে ঢোকার পরপরই বললেন, 'স্যার আপনি দিদার স্যারের বন্ধু একথা আগে বলবেন না! বসুন স্যার, কি খাবেন? আপনিতো স্যার একেবারে বিধ্বস্ত, কাপড় চোপড়ে মাটি-ময়লা লেগে আছে, সারারাত মনে হয় ঘুমাননি, খাওয়া দাওয়াও হয়নি। আপনি এক কাজ করুন, এই যে কাছেই আমাদের থানার একটা ডরমেটরি আছে, আমি একজন কনস্টেবল দিচ্ছি, ওর সাথে গিয়ে ওখানে রেস্ট নেন। এর মধ্যে আমি সমস্ত ফর্মালিটি শেষ করে, আপনাকে নিয়ে স্পটে যাবো।'
থানার রেস্টহাউসে গিয়ে প্রথমেই মোবাইল চার্জে দিলাম, তারপর ফ্রেস হয়ে, নাস্তা সেরে একটু বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিতেই কখন যে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম, টেরই পাইনি।
দরজার কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো। তাকিয়ে দেখি, সকালের সেই কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। বললেন, 'স্যার দুপুরে খাবেন না?'
– দুপুর? বলেন কী? কয়টা বাজে?
– দুপুর দুইটা বাজে।
– আমাকে ডাকেননি কেনো?
– স্যার আপনি যেভাবে ঘুমুচ্ছিলেন, তাই ডিস্টার্ব করিনি। দারোগা সাহেব ফোন করেছিলেন, তাই ডেকে তুললাম। আপনাকে তিনটার মধ্যে রেডি থাকতে বলেছে, স্পটে নিয়ে যাবেন।
গোসলটা সারলাম। এখন অনেক ফ্রেস লাগছে, কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষুধা অনুভব করলাম।
এরমধ্যে থানার কনস্টেবল ভদ্রলোকটি ডরমেটরির বাবুর্চিকে দিয়ে টেবিলে সব খাবার-দাবার সাজিয়ে ফেলেছে।
– স্যার, শুরু করেন।
– আপনিও বসেন আমার সাথে। আচ্ছা আপনার নামতো জিজ্ঞেস করা হলো না।
– জ্বি আমার নাম মতি মিয়া, সবাই মতি কনস্টেবল বলে।
– মতি সাহেব, চলেন আমরা দুজনে একসাথে বসে খাই।
– না না স্যার, আপনি হলেন আমাদের মেহমান, আগে আপনি খান, আমি পরে খেয়ে নিবো।
আমি চটজলদি খেয়ে নিলাম। অনেক ধরনের তরকারি ছিলো, বুঝলাম সব বন্ধু দিদারের সৌজন্যে পাওয়া। খাওয়ার পর বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিলাম, যেহেতু তিনটা বাজতে এখনো অনেক দেরি। এপাশ ওপাশ করছি, কিন্তু উত্তেজনায় ঘুম আসছে না। হঠাৎ মোবাইলের দিকে চোখ পড়তেই, খুলে দেখি বন্ধু দিদারের অনেকগুলো কল। আমি ফিরতি কল দিতেই বলল, 'কিরে ফোন ধরছিসনা কেন? আমি দারোগা সাহেবকে সব বলে দিয়েছি। কোন অসুবিধা হলে আমাকে জানাস।'
এরপর আমি অফিসে ফোন করে জানালাম গাড়ি নষ্ট হওয়ায় আজ অফিসে যেতে পারছি না। যাক যথারীতি তিনটার মধ্যে দারোগা সাহেব তার গাড়ি নিয়ে হাজির। ওনার সময়জ্ঞানের প্রশংসা করতেই হয়। রুমে ঢুকেই বললেন, 'স্যার রেডি?'

দিদারের ফোনের পর থেকেই মজিদ সাহেব আমাকে 'স্যার স্যার' বলে সম্বোধন করছেন। এরপর স্পটে পৌঁছলাম, বিরাট আয়োজন। পুলিশ পুরো বাড়িটি ঘিরে রেখেছে। চারদিকে মানুষের উৎসুক মুখ। সদর থেকে ৬–৭ জন লোক আনা হয়েছে, মেঝে ভাঙার জন্য। সেখানে সম্পূর্ণ ফ্লোর কংক্রিটের, তার উপর কিছু উঁচু ঢিবি ছিলো, যেখানে আগাছা, লতাপাতার জঙ্গল ছিলো। ইতিমধ্যে কিছু আগাছা পরিষ্কার করা হয়ে গিয়েছে। .আমিতো টেনশনে ভাবছি, এত বড় বাড়ি আর সব ফ্লোর এভাবে ভাড়া কি সম্ভব! তারপরও কিছু পাওয়া না গেলে লজ্জার ব্যাপার হবে। এসব ভাবছি আর টেনশনে ঘামছি। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, একজন লোক ফ্লোরে হাতুড়ির মতো কী একটা দিয়ে কংক্রিটের মেঝেতে মাঝেমধ্যে বাড়ি দিয়ে কান পেতে কী যেন শুনছে। মজিদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওনারা হাতুড়ি দিয়ে কী করছে?'

বললেন, 'ওনারা স্পেশালিস্ট, মূল কংক্রিট ভেঙে পরে প্লাস্টার করলে, শব্দ শুনে বুঝতে পারে কোন জায়গায় এটা করা হয়েছে।'

– এত বছর পরেও কি এটা জানা সম্ভব!

বললেন, 'হ্যাঁ, এটা সম্ভব।'

এতক্ষণে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা শোরগোল শুনতে পেলাম। একজন কনস্টেবল এসে বললেন, 'এই বাড়ির বর্তমান মালিক রহমান তালুকদার সাহেব এসে চ্যাঁচামেচি করছেন। তাকে না জানিয়ে কেন তার বাড়ি ভাংচুর করা হচ্ছে।'

আমরা এগিয়ে গেলাম। আমারতো তালুকদার সাহেবকে দেখে শরীর, হাত-পা সব ঠান্ডা হয়ে গেলো। এই লোকটিইতো কাল রাতে আমাকে থাকতে দিয়েছিলেন, আপ্যায়ন করেছিলেন।

আমি কাছে গিয়ে বোকার মতো জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে চিনতে পারছেন?'

– কে আপনি? আপনাকে তো চিনতে পারছি না। আর আপনারা আমার বাড়িঘর ভাঙছেন কেন?

পরক্ষণে বুঝতে পারলাম, 'আমি উত্তেজনাবশত বোকার মতো প্রশ্ন করে ফেলেছি, কাল রাতের পুরো ব্যাপারটি ছিলো প্রকৃতির একটা রহস্য, পুরোটা একটা ইলিউশন। আর সেটা উপরওয়ালার পক্ষ থেকেই এসেছে। কেননা প্রত্যেকটা অন্যায়ের বিচার পৃথিবীতেই হয়। তাই হয়তো পুরো ব্যাপারটা আমাকে দিয়ে উন্মোচন করা হচ্ছে। আমি রাগ সামলাতে না পেরে বললাম, 'কীসের আপনার বাড়ি, এটাতো সফিক তালুকদারের বাড়ি। আপনি তাদের মেরে এই বাড়ি দখল করেছেন।'

হঠাৎ আমার প্রশ্ন শুনে তালুকদার সাহেব অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। থতমত খেয়ে বললেন আপনি এসব উল্টাপাল্টা কী বলছেন?

তখন ওসি সাহেব আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখুন তালুকদার সাহেব আমার কাছে সরকারি অর্ডার আছে। আপনি ওখানটায় বসুন আর আমাদের সহযোগিতা করুন, আমরা একটা তদন্ত করতে এসেছি। তাছাড়া এটা পরিত্যক্ত পোড়াবাড়ি, সুতরাং ভাংচুর করার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে?'

একজন কনস্টেবল এসে দারোগা মজিদ সাহেবকে বললেন, 'স্যার, সদর থেকে যে অফিসারেরা এসেছে, তারা আপনাকে ডাকছেন।'

আমরা গিয়ে দেখি, তারা দুটো জায়গা চিহ্নিত করেছেন।
মজিদ সাহেব যথারীতি ভাঙ্গার অর্ডার দিলেন। শক্ত কংক্রিট ভাঙতে ভাঙতে বিকেল সাড়ে পাঁচটা বেজে গেলো। তারপর যা পাওয়া গেলো, সবাই অবাক।
এক একটি গর্তে দুজনের কঙ্কাল পাওয়া গেল, একজন পুরুষ আরেকজন মহিলা। হাতের চুড়ি দেখে দুজন মহিলাকে চিহ্নিত করা গিয়েছে।
যেহেতু তাদের মেরে, মেঝেতে পুঁতে তারপর কংক্রিটের ঢালাই করার পর আগুন দিয়ে পুরো বাড়ি পোড়ানো হয়েছে, তাই কংকালগুলো মোটামুটি ভালো অবস্থায় আছে। হাতের নষ্ট জং ধরা লেডিস ঘড়ি আর আংটি দেখে ধরে নেয়া হয়েছে দুটি মহিলার মধ্যে এটিই নীলার লাশ। আর পুরোনো বাঁধানো দাঁত দেখে বুঝা গেছে এটি মিসেস সফিক তালুকদারের লাশ। পুরুষ লাশের পাশে শিং দিয়ে তৈরি লাঠি দেখে বুঝা গেছে এটি সফিক তালুকদারের লাশ। আর অন্য গর্তে নীলার কঙ্কালের সাথের কঙ্কালটি নীলার হাসব্যান্ড মুরাদের বলে শনাক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কালুর কঙ্কাল কোথাও পাওয়া যায়নি। পুলিশ ধারনা করলো কালুও রহমান তালুকদারের সাথে জড়িত, তাই পালিয়ে গেছে। অথবা তাকেও মেরে অন্য কোথাও গুম করা হয়েছে।

আমি নীলার লাশের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলাম। মনটা কষ্টে ভরে গেলো, কী মৃত্যু যন্ত্রণাই না তাদের পোহাতে হয়েছে। রাতেই রহমান তালুকদারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে রিমান্ডে স্বীকার করেছে, কালুর জীবিত থাকার কথা। কালু সরাসরি জড়িত ছিলো না, সব ভাড়া করা লোকদেরকে দিয়ে করানো হয়েছে। কালু এসব দেখে ভয়ে পালিয়েছে। কালুকে গ্রেফতার করার জন্য সব থানায় মেসেজ পাঠানো হয়েছে, যাতে তাকে রাজসাক্ষী করতে পারে।

বুকের ভেতরটা হালকা লাগছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানালাম। হঠাৎ দেখি, দূর আকাশে চারটি পাখি উড়ে তাদের আপন নীড়ে ফিরে যাচ্ছে। হবে হয়তো, নীলাদের আত্মা, আজ মুক্তি পেয়ে আল্লাহর আরোশে ফিরে যাচ্ছে। ঐদিনই যথারীতি থানার গাড়িতে রাত বারোটার দিকে ঢাকার বাসায় পৌঁছলাম। আমার বাবা সরকারি চাকুরি করতেন, বহু কষ্টে এই একতলা বাড়িটি তৈরি করে রেখে গেছেন। যাইহোক, মজিদ সাহেব আমার নষ্ট গাড়ির দায়িত্ব নিলেন, আর বললেন– তিনি মিস্ত্রি দিয়ে ঠিক করিয়ে আমার কাছে পৌঁছে দিবেন।

সারাদিনের ক্লান্তি শেষে যথারীতি ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ পানির ঝাপটায় ঘুমটা ভেঙে গেলো। উঠে দেখি জানালাটা খোলা, বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি। জানালাটা বন্ধ করতে যেয়ে দেখি, কে যেন জানালার পাশের গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ বৃষ্টি থেমে গিয়ে, চারদিকে জোৎস্নার আলো নেমে আসলো। সেই আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেলাম নীলাকে। সেই হাসি আর চোখের কৃতজ্ঞতার ভাষা আমার বুঝতে সমস্যা হয়নি। হঠাৎ এক চিলতে হাসি দিয়ে হাতটা

নাড়িয়ে, ঘুরে হাঁটা শুরু করল। আমি 'নীলা দাঁড়াও' বলে এক দৌড়ে দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখি– প্রচণ্ড বৃষ্টি, চারিদিকে উথাল-পাথাল ঝড়। নীলার আত্মার এতদিনের বয়ে বেড়ানো কষ্ট-যন্ত্রণা যেন আজ বৃষ্টি হয়ে ঝরছে। অথচ একটু আগে জানালা দিয়ে দেখলাম, চারদিকে জোৎস্নার আলো। আমি অবাক হলাম না, প্রকৃতির এই ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখে।
রুমে ফিরে এলাম। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি– এখনও জোৎস্নার আলোয় চারদিক আলোকিত। অথচ একটু আগে বাইরে গিয়ে দেখেছিলাম প্রচণ্ড বৃষ্টি। ভাবছি, আমি কি স্বপ্নের মধ্যে আছি, নাকি এটা একটা ইলিউশন। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল। টেবিল থেকে ডায়েরিটা নিয়ে, লিখলাম, 'নীলা–রাত ৩:১৫মিনিট।'

সকালে পাখির কিচির-মিচির শব্দে প্রতিদিনের অভ্যাসবশত ঘুমটা ভেঙে গেল। অন্যপাশে তাকাতেই দেখি ডায়েরি এবং কলমটা পড়ে আছে। হাতে নিয়ে তাকিয়ে দেখি তাতে লেখা, 'নীলা-রাত ৩:১৫ মিনিট।'

প্রকৃতি সত্যি রহস্যময়। যেখানে সত্যি আছে, কিন্তু সত্যিটা দেখা যায় না। সত্য যেখানে নির্বাসিত, কিন্তু সেখানে সত্যের বসবাস। আমরা হয়তো তার রহস্যভেদ করতে পারি না। সেখানেই মানাবজাতির সীমাবদ্ধতা।

২০১৯– হাসপাতালময় এক বছর

কাজী মাইনুল হোসেন
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

হাসপাতাল ও ডাক্তার ছেলেবেলা থেকেই যেন আমার নিত্য সঙ্গী। মা-বাবা, ভাই, দাদু, নানা, নানুকে নিয়ে হাসপাতাল-বাসা অনেক দৌড়ঝাপ করতে হয়েছে। হাসপাতালের বারান্দা, বেড, অপারেশন থিয়েটার সব যেন আমার ভীষণ পরিচিত, চেনাজানা! একরকম অভ্যস্ত হয়ে গেছি হাসপাতাল নামক শব্দটির সাথে। বড় হলে এর ব্যাপকতা আরও বেড়েছে। তেমনি একটি বছরের ঘটনা খুব মনে পড়ছে...

২০১৯ সাল– কেবলই একটি ক্যালেন্ডার বছর নয়। আমার কাছে এক আতঙ্ক, আশঙ্কা, অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তার বছর। ২০১৯ এর জুলাই মাস। ডেঙ্গুর খুব প্রকোপ চলছে তখন। আমার মেয়ে– কাজী মানহা, সবাই মানহা বলেই ডাকে। প্রাক্তন মাহমুদ স্যারসহ আরো অনেকের মানহা নামটিই পছন্দ। জুলাইয়ের ১৭ তারিখ থেকে ওর ভীষণ জ্বর। দু'দিন অপেক্ষা করলাম কিন্তু জ্বরের প্রকোপ আরো বেড়ে গেল। ওর সবকিছু আমাকে কেন্দ্র করেই– অভিযোগ, আবদার ইত্যাদি। রাতে যখন জ্বর বাড়তে থাকল এবং কোনভাবেই জ্বর কমাতে পারছিলাম না, তখন ওকে নিয়ে ঝর্ণা ছেড়ে গোসল করালাম যাতে জ্বর কমে। এরকম পরপর দু'রাত করতে হলো। রাতে বেশি জ্বর থাকে কিন্তু দিনে কম থাকে। ২১ তারিখে প্যাথলজি পরীক্ষা করানো হলো, দুপুরে যখন রিপোর্ট দিলো আমি তখন অফিসে। জানতে পারলাম ওর ডেঙ্গুর রেজাল্ট পজিটিভ ও প্লাটিলেটও কম। আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো! ওর ব্লাড প্রেসার কমে যাচ্ছিলো, ডাক্তার দ্রুত হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দিলেন। আমার পরিচিত একজন ডাক্তার আঙ্কেলের সাথে কথা বলে মানহাকে বাড্ডার এএনজেড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। কর্তব্যরত চিকিৎসক ওর অবস্থা দেখে দ্রুত আইসিইউ-তে ভর্তি করলেন। আমি যখন অফিস থেকে হাসপাতালে আসলাম তখন আমাকে দেখে ও কী যে করলো তা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। পরিবারের কাউকে আইসিইউ-তে দেখবো কখনো চিন্তা করিনি। অথচ আমার একমাত্র মেয়ে মানহা এই মুহূর্তে আইসিইউ-তে! সেখানে থাকা রোগীদের মধ্যে মানহার বয়সই সবচেয়ে কম।

শুরু হলো আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষের চিকিৎসা। হাসপাতাল যেন আমাকে ছাড়তেই চায় না! যাই হোক, আইসিইউ-তে কাউকে থাকতে দেয়া হয় না। আমার পরিবারের সকলে আইসিইউ এর সামনে দাঁড়িয়ে। আমি চিন্তা করছি– রাতে মেয়ে একা কীভাবে থাকবে, চিন্তায় আমার পাগল হওয়ার মতো অবস্থা! আইসিইউ-তে কারো থাকার কোন অনুমতি নেই জেনেও ডা. আঙ্কেলকে বললাম– চেষ্টা করে দেখতে অন্তত মানহার আম্মুকে ভিতরে রাখা যায় কিনা। মেয়েটা একা কীভাবে থাকবে। অনুমতির অপেক্ষায় রাত একটা পর্যন্ত আমরা আইসিইউএর সামনে দাঁড়ানো। ওদিকে মানহা বারবার আমাকে খুঁজছে, আমার আত্মাটাও ওর কাছেই পড়ে আছে। রাত দেড়টায় নার্স জানালেন, ডা. আঙ্কেলের অনুরোধের প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র মানহার আম্মুকে আইসিইউএর ভিতরে থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আমি বাসায় যেতে পারিনি, হাসপাতালের রিসিপশনে বসেছিলাম সারারাত। যে কয়দিন হাসপাতালে ছিলাম, মানহা আমাকে বারবার খুঁজতো, কিছু খেতে চাইতো না। রক্ত দেয়া-নেয়ার সময় ওর কান্না আমি সহ্য করতে পারতাম না, তাই শুনতে চাইতাম না। একটা সময় মানহার রক্ত নেয়ার সময়, খাবারের সময় নার্সরা আমাকে ডাকতেন। আমি গেলে মানহাও খুশি হতো। এভাবে চলতে থাকলো। চতুর্থ দিনে মানহার রক্তের প্লাটিলেট কমতে লাগলো। দুইবেলা রক্ত নিতে হতো। হঠাৎ ওর রক্তের প্লাটিলেট ৬০০০০ থেকে কমে ২০০০০ এ নেমে গেল। ডা. আঙ্কেলসহ সবাই শঙ্কিত হলেন। মাত্র দুই ঘণ্টার ব্যবধানে প্লাটিলেট এত কমার কথা না! ডা. আঙ্কেল নিজেই প্যাথলজিতে গেলেন, রিপোর্ট চেক করে একই তথ্য পেলেন। আমাদের দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে গেল। ডাক্তার আঙ্কেল মানহাকে রক্ত দেয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে বললেন। নার্স, ডাক্তার ও আমাদের সকলের নজর মানহার দিকে। সবাই ওর সুস্থতার জন্য খুব চেষ্টা করছেন। অবস্থা এমন যে, আমরা এখন বিনা বাঁধায় আইসিইউতে ঢুকছি, বের হচ্ছি। সৃষ্টিকর্তার অশেষ কৃপায় পঞ্চম দিন থেকে মানহার প্লাটিলেট বাড়তে লাগলো। মানহাকে যখন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিলো তখন তাকে একটি এন্টিবায়োটিক দেয়ার প্ল্যান ছিলো কিন্তু ডেঙ্গুর কারণে তা দিতে পারেনি। এজন্য মেয়ে অনেক কষ্ট করেছে। জোরে কাঁদতেও পারতো না। আমার কানে কানে বলতো আর আমি ওর কষ্টগুলো অনুভব করতাম। মেয়ের অসুস্থতায় চোখে অশ্রু না ঝরলেও মনের অশ্রু ঝরে চলেছিলো অবিরাম। আইসিইউ থেকে যখন নরমাল বেডে নেয়া হলো তখন মানহাকে দেখতে আমার সহকর্মীরাও এসেছিলেন। সপ্তম দিনে ওর রক্তের প্লাটিলেট বাড়তে থাকায় চিকিৎসক ওকে ডিসচার্জ করে দিলেন। আমার এবারের হাসপাতাল অভিযাত্রার সমাপ্তি ঘটলো। এই সাতদিন হাসপাতালে থেকে যা দেখেছি তা ভুলার মতো না। কত বাবার আহাজারি, কত মায়ের আহাজারি দেখেছি– দিনে, দুপুরে কিংবা মধ্যরাতে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। ওই সময়ে হাসপাতাল ভর্তি ছিলো সব ডেঙ্গু রোগী। কোথাও কোনো সিট খালি ছিলো না। সুস্থ রাখার মালিক সৃষ্টিকর্তা, তবে আমাদের সাবধান থাকতে হবে। নিজের বাসার আশেপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। কোথাও পানি জমতে দেয়া যাবে না।

যাহোক, ২০১৯ সালের জুলাই মাসের শেষদিন। অফিসে গুরুত্বপূর্ণ এক ক্রেতার ভিজিট

চলছে। প্রচণ্ড ব্যস্ত সময় পার করছি। আম্মু-আব্বু গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। আম্মু ফোন দিয়ে জানালেন– তোমার আব্বু অসুস্থ, ঠিকমতো কথা বলতে পারছেন না। ভাবলাম, উনার যেহেতু আগে থেকেই ঠান্ডার সমস্যা ছিলো তাই হয়তো ঠান্ডাজনিত কারণে গলাটা বসে গেছে। এজন্যই হয়তো কথা বলতে পারছেন না। আমি অভয় দিলাম– ঠিক হয়ে যাবে, কোনো চিন্তা করবেন না। দু'এক ঘণ্টা পর আম্মু আবারো ফোন দিলেন। এবার কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানালেন– তোমার আব্বু স্ট্রোক করেছে, তাই এইরকম অবস্থা তার। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিলাম এবং বললাম আব্বুকে দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যেতে। ছোট ভাইকে গ্রামে পাঠালাম, পরিস্থিতি বুঝে যেন আব্বুকে দ্রুত ঢাকা নিয়ে আসে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আব্বুকে কিছু পরীক্ষা করালেন কিন্তু পরীক্ষায় তেমন কোনো সমস্যা ধরা পড়লো না। কিন্তু ধারণা করছে স্ট্রোক করেছেন, নিশ্চিত হওয়ার জন্য চিকিৎসক এমআরআই করানোর পরামর্শ দিলেন কিন্তু সেখানে এমআরআই করানোর কোনো ব্যবস্থা না থাকায় ছোট ভাই আব্বুকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিলো। রাত বারোটায় ঢাকার নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে এমআরআই করানো হলো। রিপোর্টে জানতে পারলাম, আব্বু স্ট্রোক করেছেন, ব্রেনে রক্ত জমেছে। আব্বু মুখের জড়তায় কথা বলতে পারছেন না। নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে ভর্তি করাবো কিন্তু কোনো সিট খালি নেই। চিকিৎসক পরামর্শ দিলেন হাসাপাতালে ভর্তি করে ৭২ ঘণ্টা অবজারভেশনে রাখতে পারলে ভালো হতো আর তা না হলে বাসায় নিয়ে ৭২ ঘণ্টা খেয়াল রাখতে হবে। আমরা ঠিক করলাম– আব্বুকে হাসপাতালেই রাখবো। আমার এক চিকিৎসক ভাবীকে ফোন দিলাম। তিনি তেজগাঁওয়ের ইমপালস হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেন। আমরা পৌঁছে দেখলাম– ভাবী আগে থেকেই বলে রেখেছেন। ফলে দ্রুত সব ব্যবস্থা করা হয়ে গেল। আব্বুকে প্রয়োজনীয় টেস্ট দিয়ে এইচডিইউ-তে ভর্তি করানো হলো। আবার হাসপাতালে শুরু হলো এক অজানা আশঙ্কা! আমি সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারলাম না। এইচডিইউ-এর সামনেই দাঁড়িয়ে থাকলাম, যদি কোনো জরুরি প্রয়োজন হয়। অন্যদের দেখলাম বেঞ্চের ওপর শুয়ে থাকতে। সকাল সাড়ে সাতটায় ছোটভাই এলে আমি অফিসে চলে গেলাম। ফোনে সারাদিন খোঁজ-খবর নিলাম। পরদিন শুক্রবার থাকায় ভাবলাম, বিকালে বাসায় গিয়ে ঘুমাবো এবং রাতে এইচডিইউ-তে আব্বুর কাছে থাকবো। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরলাম, ফ্রেস হয়ে কিছুক্ষণ ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন সময় কাদির স্যার (এজিএম–ফ্যাক্টরি অপারেশন্স) ফোনে জানালেন– রাজু সাহেব (প্রাক্তন ম্যানেজার, সুইং) স্ট্রোক করেছেন। উনাকে সোহরাওয়ার্দীতে নেয়া হলে সেখান থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। আমরা এখন কোথায় নিয়ে যাব– ইবনে সিনা নাকি ঢাকা মেডিকেলে, বুঝতে পারছি না কি করব? ওনার অবস্থা ক্রিটিক্যাল। কোথায় যাবো, কি করবো তুমি পরামর্শ দাও। আমি দশ মিনিট সময় চাইলাম। বুঝতে পারছিলাম না কেন এভাবে একের পর এক বিপদ আসছে। যাহোক, বিভিন্ন জনের সাথে যোগাযোগ করেছি, ইন্টারনেটে সার্চ করেছি। সবশেষে ডা. নাতালিয়া তাবনি (প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, ব্যাবিলন গার্মেন্টস লি:) কে ফোন করে বিষয়টি জানালে তিনি মেট্রোপলিটন মেডিকেল সার্ভিসে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। আমি

কাদির স্যারকে মেট্রোপলিটনে নিয়ে যাওয়ার কথা বললাম। স্যার আমাকে সেখানে আসার জন্য বললেন। গত রাতের না ঘুমানো এবং সারাদিন অফিসে কাজ করে ভীষণ ক্লান্ত আমি স্যারকে না বলতে পারিনি, ছুটে গেলাম হাসপাতালে। পৌঁছে দেখি রাজু সাহেব যেন মৃত লাশের মতো। চিকিৎসক তাকে দেখে দ্রুত আইসিইউ-তে ভর্তি করলেন। কিছুক্ষণ পর আইসিইউ-থেকে জানতে চাইলেন, রাজু সাহেবের কোনো আত্মীয়-স্বজন কেউ আছেন কিনা? তখনও রাজু সাহেবের কোনো আত্মীয় স্বজন এসে পৌঁছায়নি এবং আরো জানলাম– তার ছেলেটাও ডেলটা হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী হিসেবে ভর্তি রয়েছে। কাদির স্যার আমাকেই ভিতরে যেতে বললেন। আমি ভিতরে গেলে ডাক্তার আমাকে যা জানালেন, তা শুনতে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি জানালেন, তার অবস্থা খুবই ক্রিটিকাল এবং যেকোনো সময় তাকে লাইফ সাপোর্টে নিতে হবে। যেহেতু তার কোনো আত্মীয়-স্বজন এখনো এসে পৌঁছায়নি এবং তার অবস্থা খুবই ক্রিটিকাল, তাই তিনি আমাকে একটি ফরম দিয়ে তাতে স্বাক্ষর করতে বললেন। আমি দেখলাম তাতে লেখা– রোগির মৃত্যু হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়। আইসিইউ-এর মতো ঠান্ডা স্থানেও উক্ত কাগজে স্বাক্ষর করতে গিয়ে আমি ঘামতে শুরু করলাম। আইসিইউ থেকে বের হয়ে কাদির স্যারকে বিস্তারিত সব জানালাম। তিনি সব মন দিয়ে শুনলেন। আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম প্রফেসর ডা. কনক কান্তি স্যারের জন্য। উনি রাত ১০.৩০ এর সময় আসলেন। কিছুক্ষণ পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাদের জানালেন, কনক কান্তি স্যার রোগির আত্মীয়-স্বজন এর সাথে কথা বলবেন। ইতোমধ্যে রাজু সাহেবের দুইজন আত্মীয় উপস্থিত হলেন, যারা খুব কাছের নয়। দুইজন আত্মীয় এবং আমরাসহ তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাদের জানালেন– রোগির অবস্থা খুব ক্রিটিক্যাল এবং জরুরি অপারেশন লাগবে, চান্স ৫০/৫০। আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করবো বাকিটা সৃষ্টিকর্তার হাতে। ডা. কনক কান্তি স্যার রাত ১১.৩০ এ চলে গেলেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাদের জানালেন ডা. কনক কান্তি স্যার আগামীকাল সকাল ৮.৩০ এ আসবেন। অপারেশন করালে আপনারা সকালের মধ্যে কাউন্টারে দুই লক্ষ টাকা জমা করে দিবেন। কাদির স্যারের সাথে আলোচনা করে আমরা একমত হলাম যে, রাজু সাহেবকে বাঁচাতে শেষ চেষ্টা হিসেবে অপারেশন করাতে হবে, বাকিটা সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা। রাজু সাহেবের আত্মীয়-স্বজনদের জানানো হলো। কাদির স্যার টাকা ম্যানেজ করার দায়িত্ব নিয়ে চলে গেলেন। হাসপাতালে কে থাকবে তা ম্যানেজ করে আমি পাশেই ইমপালস হাসপাতালে চলে গেলাম, যেখানে আমার আব্বু ভর্তি আছেন। সারারাত বসে থাকলাম এইচডিইউ-এর সামনে। ফোনে রাজু সাহেবেরও খোঁজ-খবর নিলাম। রাতে তার বিভিন্ন পরীক্ষা করানো হলো। সকালে ছোট ভাইকে রেখে আবারো মেট্রোপলিটনে রাজু সাহেবের কাছে চলে গেলাম। কাদির স্যার টাকার ব্যবস্থা করলেন। অপারেশনের ব্যবস্থা হলো। বেলা এগারোটায় তার অপারেশন শুরু হলো। এর মধ্যে আনুষঙ্গিক অনেক কাজ করতে হলো– রক্তের ব্যবস্থা করা, মেডিসিন, আরো কত কী! ইতিমধ্যে রাজু সাহেবের দুই ভাইও চলে আসলেন। দুপুর দুইটার দিকে কনক স্যার অপারেশন রুম থেকে বের হলেন এবং জানালেন, তার দিক থেকে যা করার তিনি চেষ্টা করেছেন। বাকিটা সৃষ্টিকর্তার হাতে। আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম।

আইসিইউ থেকে তেমন কিছু জানা যাচ্ছিলো না। আমি নাতালিয়া আপার সাহায্যে জানতে পারলাম, রাজু সাহেবের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। একসময় রাজু সাহেবকে আইসিইউ থেকে সিসিইউতে, তারপর কেবিনে। আমার মনে হয় তার দৃঢ়চেতা মনোভাব, শুভাকাঙ্খীদের দোয়া, চিকিৎসক, আমাদের সকলের সময়মতো হাসপাতালে নেয়া এবং সৃষ্টিকর্তার কৃপায় তিনি মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফেরত আসতে পেরেছেন। শুধু তাই নয় তিনি আবারো তার কর্মস্থলেও ফিরে আসতে পেরেছিলেন এবং ভালোভাবেই চাকরি করেছিলেন। যদিও পরবর্তীতে তিনি আর বেশিদিন চাকরি করেননি। তার অসুস্থতা থেকে শুরু করে বাসায় ফেরা পর্যন্ত প্রতিটি বিষয় আমাকে ফলোআপ করতে হয়েছে। এরপর ঈদ-উল-আজহা গেলো, ঈদের দিনেও তাকে দেখতে তার বাসায় গিয়েছি– দায়িত্ব ও মানবিকতা থেকেই। আসলে এসব কাজে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ভালো থাকুক উনি যেখানেই থাকুক না কেন। অন্যদিকে সৃষ্টিকর্তার কৃপায় আমার আব্বুও কিছুটা সুস্থ হওয়ায় তাঁকেও বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়।

আগস্ট ২০১৯। আম্মু কিছুদিন যাবত অসুস্থবোধ করছেন। একদিন দুপুর বেলায় বাসা থেকে ফোন আসলো– আম্মু কেমন যেন করছেন। আমি কিছু পরামর্শ দিলাম। কিন্তু ফোনে কান্নার জন্য কথা বলতে পারছে না কেউ। সবার কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি অফিসে ছিলাম, চিন্তায় অস্থির হয়ে গেলাম। আমাকে জানানো হলো কাছের একটি হাসপাতাল থেকে আম্মুকে ফেরত দেয়া হয়েছে। এখন তারা এএনজেড এর দিকে যাচ্ছে। এবার আমি ভয় পেয়ে গেলাম এবং অফিস থেকে হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হলাম। ৪০–৪৫ মিনিটের মধ্যে আমি পৌঁছে গেলাম। আম্মাকে আইসিইউ-তে নিয়ে যাওয়া হলো। আমার ডা. আঙ্কেল ছিলেন। আমাকে দেখে সবাই কেঁদে উঠলেন। আমি ওদের সান্ত্বনা দিবো না নিজেকে সামলাবো! আম্মা একদম নিস্তেজ ও অজ্ঞান ছিলেন। ওনার মুখে অক্সিজেন দেয়া হলো। তারপর বিভিন্ন প্যাথলজিকাল পরীক্ষা এবং অপেক্ষা। চিকিৎসকগণ সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বলতে পারছেন না। কেবল ধৈর্য্য ধারণ করতে বলছেন। প্রায় ছয় ঘণ্টা পর আম্মার জ্ঞান ফিরলো। আমরা কিছুটা সান্ত্বনা খুঁজে পেলাম। তারপর বিভিন্ন পরীক্ষা, চিকিৎসা চলতে থাকলো। আবার আইসিইউ-এর সামনে অপেক্ষা। চতুর্থ দিনে আম্মাকে আইসিইউ থেকে কেবিনে নেয়া হলো। আম্মা সুস্থবোধ করলে আমরা আম্মাকে বাসায় নিয়ে গেলাম। আইসিইউতে থাকা অবস্থায় সবাই গেছে আম্মুকে দেখতে কিন্তু আমি ভিতরে যাই নাই। কারণ সে মনোবল ছিলো না আমার। গত কয়েকমাসে আমি বিভিন্ন ক্রিটিক্যাল রোগী নিয়ে এত হাসপাতালে ঘুরেছি যে, আমি খুব ক্লান্ত ও চিন্তিত ছিলাম। যদিও পরে আম্মু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাকে কেন আমি দেখতে যাইনি। আমি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ ছিলাম। জানি না আম্মু বুঝতে পেরেছিলেন কিনা যে, ওই অবস্থায় আম্মুকে দেখে আমি সহ্য করতে পারতাম না বলেই যাইনি।

সুস্থতা সৃষ্টিকর্তার অনেক বড় নিয়ামত। সবাই সুস্থ থাকা দরকার। পরিবারের কেউ একজন অসুস্থ হলে বা হাসপাতালে থাকলে বাকি সদস্যদের খুব দুশ্চিন্তা করতে হয়। একসময় মনে

হয় অসুস্থ ব্যক্তির মতো অপেক্ষায় থাকা স্বজনরাও অসুস্থ। তাই সুস্থ থাকতে সঠিক নিয়ম মেনে চলা উচিত। ব্রেইন স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক কিংবা যেকোনো ক্রিটিকাল রোগের লক্ষণ দেখা দিলে দেরি না করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। ২০১৯ সাল আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। হাসপাতাল, রোগী, রোগের উপকরণ, বিভিন্ন ধরনের অসুখ, ঔষধ ইত্যাদি। অনেক ডাক্তার এর কাছে গিয়েছি– বাবা, মা, সন্তান, সহকর্মীদের নিয়ে। ২০১৯–যেন আমার কাছে দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা, অপেক্ষা এবং হাসপাতালময় এক বছর!

মর্নিং মিটিং

নাজমুল হুদা আহমদ
প্রাক্তন গ্রুপ জিএম, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

দীর্ঘদিন করোনার সাথে বাসায় ও হাসপাতালে যুদ্ধ চলছিলো। যেন যমে আর মানুষে টানাটানি! অসুস্থতার দিনগুলোর জন্য অনিচ্ছাকৃতভাবেই অফিস কামাই হয়েছে। প্রচণ্ড শারীরিক ও মানসিক চাপ নিয়ে যখন কিছুটা সুস্থ ঠিক তখনই কলুর বলদের মতো সংসারের অপার দায়িত্ব কাঁধে এসে হাজির। আল্লাহ এ গুরু দায়িত্ব পালনের জন্যই হয়তোবা এই যাত্রায় পুনর্জন্ম দিয়েছেন আমাকে। সবেমাত্র হোম অফিস (ভার্চুয়াল) আরম্ভ করেছি। প্রতিদিন সকালের ম্যানেজমেন্ট মিটিং (মর্নিং মিটিং) আমার ব্রিফিং দিয়ে শুরু হতো। অসুস্থতার কারণে অনেকদিন পর আজ ক্লান্ত শরীর ও ক্লান্ত দুচোখ জুড়ে গভীর ঘুম আর বিষাদ অনুভব করছিলাম।

হঠাৎ দেখি চারদিকে সবুজ ঘাসের বিস্তীর্ণ মাঠ! দূরে তিনদিকের পাহাড়গুলি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর মাঝে দেবদারু, শিরীষ, মেহগনি, জারুল ও নাম না জানা গাছের ঘন বনের সারি। এ যে আমার অতি প্রিয়, ভালোবাসা ও ভালোলাগার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ! এইখানেই আমার প্রতিদিন বিকেলের সময় কাটতো নানা ধরনের খেলা নিয়ে। কখনও বাস্কেট বল, কখনও হ্যান্ড বল, ইত্যাদি। মাঠের পাশেই রয়েছে রোভার স্কাউটস ডেন। আজ রোভারদের পুনর্মিলনী, আমরা প্রাক্তনরা আজ অতিথি। আনন্দ আয়োজন চলছে। স্মৃতির মণিকোঠার মাঠে ঘুরছি, ফিরছি। হঠাৎ দূরে দেখতে পেলাম একজনকে, অত্যাধুনিক ও বিচিত্র সব লেন্স দিয়ে আপন মনে ও পরম মায়ায় কখনো গাছের, একদল ছাগলছানা কিংবা প্রকৃতির ছবি তুলে চলেছেন। কোনোদিকেই যেন তাঁর কোনো খেয়াল নেই। কৌতূহলবশত কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি আমার অতি পরিচিত ও প্রিয় মুখ– শ্রদ্ধেয় এমদাদ স্যার। স্যারকে দেখে আমার যে কী ভালো লাগলো! আমাকে দেখে স্যার বেশ অবাক হলেন। উনাকে আমার অনুষ্ঠানের কথা জানালাম এবং ছবি তোলার ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা ও ভালোবাসার কারণে ক্যাম্পাসের আরও দর্শনীয় স্থানে ছবি তোলার জন্য তাঁকে আমার সাথে নিয়ে গেলাম।

এখন যেন আমার কোন ক্লান্তি নেই, যেন এক অজানা শক্তিতে বলীয়ান আমি! স্যারের সাথে

সারাদিন ঘোরাঘুরি, প্রকৃতিকে ভিন্নভাবে অনুভব করতে লাগলাম। আজ যেন আমার কোথাও হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা। স্যার ছবি তুলছেন– ঘাস ফড়িংয়ের, নীল আকাশের ধবল মেঘের, পাহাড়ের ঝর্ণাধারার, ভালোবাসার কপোত-কপোতির হাত ধরে হেঁটে চলার, সাটল ট্রেনের, চায়ের ঝুপড়ি ঘরের, ঘুড়ি উড়ানোর আরও কত কী! আজ আর কোনো অবসাদ নেই।

হঠাৎ মনে হলো কে যেন বারবার ডাকছে আমায়। ক্রমেই সে ডাক আরও স্পষ্ট ও জোরে শোনা যাচ্ছে– কই এখনও ঘুমাচ্ছো, তোমার ভার্চুয়াল মিটিংয়ের সময় হয়ে এলো। চোখ মেলে দেখি সকাল নয়টা বাজে। স্ত্রীর ওপর একটু বিরক্ত হলাম, এত সুন্দর স্বপ্নটার সমাপ্তি ঘটানোর জন্য। যাহোক, তড়িঘড়ি করে ঘুম থেকে উঠলাম। ব্যস্ততা শুরু হলে গেল আবার। সকল ইউনিটের খবর নিতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ কোনো অডিট/ভিজিট আছে কিনা, গতকাল কেউ করোনা আক্রান্ত হলো কিনা, স্বাস্থ্যবিধির কথা, গতকালের মৃতের সংখ্যা, সাবধান বাণী, সতর্কতা, আরো কত কী! এ যেন এক হার না মানার গল্প। শত প্রতিকূলতার মাঝেও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দলীয় ঐক্যে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার গল্প...

বৃষ্টিমুখর দুপুর

আরিফ হোসেন
জুনিয়র ম্যানেজার, এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন গ্রুপ

অলস দুপুরে বিছানায় গড়াগড়ি করছিলাম। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি– সমস্ত আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। চারদিকে ঘোলাটে অন্ধকার। হঠাৎ বৃষ্টি নামলো বেশ জোরেশোরেই। ক্যালেন্ডারে তাকিয়ে দেখি আজ আষাঢ় মাসের দুই তারিখ। গ্রীষ্মের ভ্যাপসা গরমের পর প্রকৃতিতে বর্ষার এ বৃষ্টি যেন শীতলতার পরশ নিয়ে এসেছে। জানালার পাশে বসে বৃষ্টি দেখছিলাম। টিনের চালে বৃষ্টির শব্দে কেমন যেন অদ্ভুত সুরের সৃষ্টি হচ্ছিলো। তবে মনটা উদাস আর আনমনা লাগছিলো। জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিরা মনের কোণে উঁকি দিচ্ছিলো বারবার। বৃষ্টির দিনগুলোতে কী যেন হয় আমার! কেবলই অতীতের কথা মনে পড়ে। কখনো কখনো মৃত্যুর কথাও স্মরণ হয় খুব। পৃথিবীটা তখন একদমই অর্থহীন মনে হয়। হঠাৎ মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা...

বাবার কর্মস্থল জামালপুর জেলায় হওয়ার সুবাদে লক্ষ্মীপুর জেলায় বাড়ি হলেও আমার ছেলেবেলা কেটেছিলো জামালপুর জেলার ফুলবাড়িয়া গ্রামে। প্রথম শ্রেণি থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত ওখানেই পড়াশুনা করেছিলাম আমি। তখনকার সময়ের অনেক স্মৃতি এখনো অবসরে মনে পড়ে আমার। ফুলবাড়িয়া গ্রামের মেঠোপথের মাটির গন্ধ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিশাল মাঠে বন্ধুদের সাথে দৌড়ে বেড়ানো, ফুটবল খেলা, বিদ্যালয়ের পুকুরে গোসল করা, এমনকি ছুটির সময়ের ঘণ্টার শব্দ এখনো যেন শুনতে পাই আমি! তখন ফিরে যেতে ভীষণ ইচ্ছে করে আবারো সেই স্কুল জীবনের সময়টাতে, আমার ছেলেবেলায়।

সাড়ে চার বছর বয়সেই আমাকে প্রথম শ্রেণিতে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন মা। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণিতে একই স্কুলে পড়েছি। পঞ্চম শ্রেণিতে উত্তীর্ণের পর নতুন স্কুলে ভর্তি হই। সেসময়ের একটি মজার স্মৃতি এখনো মনে পড়ে আমার। শারীরিক গড়নে ছোটখাটো ছিলাম বলে প্রথম দেখাতে মনেই হতো না যে, আমি পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি। পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তির পর প্রথমদিন নতুন স্কুলে ক্লাস করতে গিয়েছিলাম। মনে নানা কৌতুহল ছিলো, সহপাঠীরা কেমন হবে, টিচাররাই বা কেমন– এরকম নানা ভাবনা নিয়ে সেদিন ক্লাসে ঢুকে মাঝামাঝি একটি বেঞ্চে চুপচাপ বসি। একটি ছেলে আমার দিকে এগিয়ে আসে এবং বলে,

– এটা তো ফাইভের ক্লাস, থ্রির ক্লাস দুই রুম পরে। তুমি ওখানে গিয়ে বসো।
আমি তাকে জানাই,
– আমি এ স্কুলে নতুন ভর্তি হয়েছি এবং আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি। কিন্তু ছেলেটি আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে বলে,
– এ্যাঁ, ফাইভে পড়ে! যা, ক্লাস থ্রির রুমে যা।
এই বলে আমার ব্যাগ কেড়ে নিয়ে জোর করে ক্লাস থ্রির রুমে রেখে আসে। আমার কোনো কথাই ওই ছেলেটিসহ কেউ শোনেনি। আমি ব্যাগ নিয়ে ক্লাস থেকে বের হয়ে কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। ম্যাডাম ক্লাসে ঢুকার পর আমিও ক্লাসে ঢুকি। ম্যাডাম আমাকে বলেছিলেন–
তুমি দেরি করে এসেছো কেন? আমি ম্যাডামকে সব খুলে বলার পর তিনি একটু হাসলেন এবং ক্লাসের সবাইকে জানালেন, আরিফ নতুন ভর্তি হয়েছে। আজ থেকে তোমাদের সাথেই ক্লাস করবে। ম্যাডামের কথা শুনে সবাই আমার দিকে তাকিয়েছিলো কিছুক্ষণ। ক্লাস শেষে আমার ব্যাগ ক্লাস থ্রির রুমে রেখে আসা সেই ছেলেটি আমাকে সরি বলেছিলো। ওর নাম জানতে পারলাম–উৎপল। ওর সাথে মেশার পর বুঝলাম, বেশ চটপটে ও দুরন্ত স্বভাবের ছেলে উৎপল। যদিও আমি ওর ঠিক বিপরীতই ছিলাম তবু ওর সাথে আমার ভালো বন্ধুত্ব হয়েছিলো। ক্লাসে এমনকি পরীক্ষার সময়ও আমরা একসাথেই বসতাম। স্কুলের সাথেই উৎপলের বাড়ি ছিলো। বেশ কয়েকবার ওদের বাড়িতেও গিয়েছিলাম আমি।

৬ষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণের পর নিম্নবিত্ত পরিবার হওয়ার সুবাদে অর্থ সংকটে ভালো স্কুলে ভর্তি হতে পারিনি আমি। একটি বহুমুখী স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। সেখানে অন্ধ ও বধিররাও পড়াশুনা করতো। যদিও ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে কোনো বধির ছিলো না, কয়েকজন অন্ধ ছাত্র ছিলো। ওদের বই ছিলো আলাদা ধরনের। বইয়ের পাতায় ছোট ছোট বিন্দু ছিলো। সে বিন্দুগুলো স্পর্শ করে ওরা পড়শুনা করতো। আমি বেশ অবাক হতাম! কীভাবে এতে হাতের স্পর্শ দিয়ে পড়া যায়। একটি অন্ধ ছেলের সাথে আমার বেশ ভালো বন্ধুত্ব হয়। আমরা একসাথে বসতাম প্রতিদিন। ক্লাস বিরতিতে আমি তার সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতাম। দুপুরের আজানের সময় স্কুল থেকে আমাদের পেটিস/ পাউরুটি/ কলাসহ বিভিন্ন খাবার দিতো। খাবার বিরতিতে আমি প্রায়ই অন্ধ বন্ধুটির বই নিয়ে চোখ বন্ধ করে সে বিন্দুগুলোতে স্পর্শ করে পড়ার চেষ্টা করতাম কিন্তু কিছুই বুঝতে পারতাম না। আমি তাকে বলেছিলাম আমাকে শিখাতে কীভাবে ওই বই পড়তে হয়। সে বলতো তোমার শেখার দরকার নেই। আল্লাহ তোমার চোখের দৃষ্টি দিয়েছেন। তার জন্য আমার খুব মায়া হতো। স্কুল ছুটির পর আমরা একসাথে গল্প করতে করতে বাড়ি ফিরতাম। তিন রাস্তার মোড় থেকে আমাদের দুজনের পথ দুদিকে হওয়ায় মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে যেদিকে আমি যাবো সেদিকে অন্ধ বন্ধুটিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু সে তিন রাস্তার মোড়ে গিয়ে বলতো আরিফ, আসি তাহলে। আমি তাকে বলতাম চলো আজ তোমার বাড়ি যাবো, এই বলে আমি আমার বাড়ির দিকে তাকে নিয়ে যেতে চাইতাম। সে মুচকি হাসতো আর বলতো– তুমি তোমার

বাড়িতে যাও, আমি যাবো না। আমি ভীষণ অবাক হতাম! তিন রাস্তার মোড়ে এসে সে কীভাবে বুঝতে পারে কোনদিকে যাবে!

জানি না কেন আজ ওদের কথা খুব মনে পড়ছে। বৃষ্টির দিনগুলোতে কী যেন হয় আমার! সব কেমন যেন এলোমেলো লাগে। বুকের ভিতরটায় একটা তীব্র শূন্যতা অনুভব করি। অতীতের কথা খুব মনে পড়ে। আজ ছেলেবেলার হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের কথা খুব মনে পড়ছে। জানি না, ওদেরও কি এমন অনুভূতি হয় কখনো! একবার কোনো এক বৃষ্টির দিনে এভাবেই ভীষণ মনে পড়েছিলো ছেলেবেলার কথা। সময়টা ছিলো কোনো এক ঈদের ছুটি। আমি হুট করেই সিদ্ধান্ত নিলাম জামালপুরে যাবো। যেই ভাবা সেই কাজ। পরদিন খুব ভোরেই ঘুম থেকে উঠে চলে গেলাম জামালপুরে।

ট্রেন থেকে নামার পর কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিলো আমার, তা ঠিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। যদিও কালের বিবর্তনে আমার ছেলেবেলার গ্রামটি অনেকটা শহরে পরিণত হয়েছে। আমি যে মাটির রাস্তায় মার্বেল/ লাটিম খেলেছিলাম, সে রাস্তাটি এখন পিচঢালা। একসময়ের গ্রামের নির্জন কাঁচা রাস্তায় এখন অনবরত রিকশা ও গাড়ির হর্ন। কিন্তু আমি ঠিকই অনুভব করতে পারছিলাম– পূর্বে যেখানে যা যা ছিলো। আমি যেন কেমন ঘোরের মধ্যে ছিলাম। প্রথমেই আমার হাইস্কুলে 'সিংহজানী বহুমূখী উচ্চ বালক বিদ্যালয়' গেলাম। যে ভবনটিতে আমি ক্লাস করেছিলাম, তা একই রকম আছে! তবে পরিত্যক্ত; পাশে আরেকটি পাকা ভবন হয়েছে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো পরিত্যক্ত ভবনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিলো। কল্পনা করছিলাম এই স্কুল ভবনটিতে কেটে গেছে আমার সোনালি অতীতের অনেকগুলো দিন। স্কুলের পুকুরটা আগের মতোই আছে। পুকুরের পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম। একটা আশ্চর্য রকমের ভালোলাগা, শান্তি অনুভব করলাম।

স্কুল থেকে সোজা চলে গেলাম বন্ধু শ্যামলের বাসার উদ্দেশে। পিটিআই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উত্তর পাশের দড়িপাড়া রাস্তা দিয়ে ওদের বাসায় যেতে হয়। পিটিআই স্কুলের সামনে গিয়ে আমি রিকশা থেকে নেমে পড়ি। এ স্কুলেই আমি পঞ্চম শ্রেণিতে পড়েছি। স্কুলের ভিতরে না গিয়ে প্রথমে শ্যামলের বাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমার মনে যে কী আলোড়ন হচ্ছিলো তা বোঝানো সম্ভব না। যতই শ্যামলের বাসার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম ততই আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছিলো। শ্যামল কি বাসায় আছে? সে এখন কী করে? পড়াশুনা নাকি অন্যকিছু? এখন দেখতে কেমন হয়েছে শ্যামল? ও কি আমাকে দেখলে চিনতে পারবে?– এরকম কত শত প্রশ্ন মনে ভিড় করেছে তার হিসেব নেই। ওদের বাসার কাছে গিয়ে ঠিক চিনতে পারছিলাম না। এত এত বাড়ি-ঘর, রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছে যে, কেমন যেন এলোমেলো লাগছিলো। একটা রাস্তার সামনে গিয়ে আচমকা থেমে গেলাম। মনে হতে লাগলো এ রাস্তা দিয়ে আমি যেন অনেক হেঁটেছি। অদ্ভুত এক অনুভূতি! একটা দ্বিধা

নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। অতীতের স্মৃতির সাথে মিলানোর চেষ্টা করছি, কখনো পরিচিত আবার কখনো অপরিচিত মনে হচ্ছে। এভাবেই এগিয়ে চলেছি। দূরে একটি ছেলেকে দেখলাম এ রাস্তা ধরেই এগিয়ে আসছে। ভাবলাম তাকে জিজ্ঞেস করবো শ্যামলের কথা। কাছাকাছি আসতেই কী যে হলো, কিছুই বলতে পারলাম না। কেমন যেন অদ্ভুত অনুভূতি হলো। ছেলেটিকে ভীষণ পরিচিত মনে হলো আমার! ছেলেটি আমাকে ক্রস করে কিছুদূর চলে গেলেও বারবার পিছনে ফিরে তাকাচ্ছিলো, আমিও একই কাজ করছিলাম। অনেকটা ছেলেবেলার বন্ধু শ্যামলের মতো ওর চেহারাটা। ছেলেটা একসময় দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। আমি আরও একটু সামনে যেতেই একটা বাড়ি দেখতে পেলাম। কেন যেন মনে হচ্ছিলো- এটাই শ্যামলের বাড়ি হবে। একটি ছোট্ট মেয়েকে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি শ্যামলদের বাড়ি। মেয়েটি বললো– হ্যাঁ, শ্যামল ভাইয়াদের বাসা। আমি দুরু দুরু বুকে গেটের সামনে গিয়ে শ্যামল বলে ডাক দিলাম। কিছুক্ষণ পর একজন মহিলা এসে গেট খুললেন। আমি চিনতে পারলাম উনিই আন্টি, মানে শ্যামলের মা। আমাকে ভীষণ অবাক করে দিয়ে আন্টি বললেন,

– আরিফ তুমি! আমি কেমন যেন কাঁপছিলাম। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠেই জিজ্ঞেস করলাম,

– আন্টি, আপনি আমাকে চিনলেন কীভাবে! এতটা বছর পরও!!

– আরিফ, তোমার চেহারা কিন্তু পাল্টায়নি একটুও। কেবল বয়সটাই বেড়েছে। কত এসেছো আমাদের বাড়িতে। আমাকে তিনি জানালেন– শ্যামল তো এইমাত্রই বাজারে গেল। তোমার সাথে দেখা হয়নি? অবশ্য এতবছর পরে তোমাকে চিনবে কীভাবে!

আমি বুঝতে পারলাম, রাস্তায় একটু আগে যাকে দেখে বারবার পিছনে ফিরে তাকিয়েছিলাম, হয়তো সে আমার বন্ধু শ্যামল।

আন্টি আমাকে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেলেন। একটু পরই শ্যামল এসে হাজির। আমাকে দেখে এবার সে বলেই ফেলল, – তুই আরিফ না!

– আমি বললাম নাতো, আরিফ কে?

আন্টিকে হাসতে দেখে শ্যামল আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমি অনুভব করলাম। সেই ছোট্টবেলার শ্যামলের স্পর্শ।

বাবা সৌদি আরব চলে যাওয়ার পর আমরাও জামালপুর ছেড়ে ঢাকায় চলে আসি। এরপর আর কখনো জামালপুরে যাওয়া হয়নি আমার। গল্প করার এক পর্যায়ে শ্যামল জানিয়েছিলো, আমাকে দেখে কেন যেন তার মনে হচ্ছিলো ছেলেটাকে আরিফের মতো লাগে। কিন্তু সে মনে মনে এও ভাবছিলো, আরিফ তো ঢাকায় থাকে। এখানে এত বছর পর কেন আসবে! শ্যামল এসব ভাবতে ভাবতে ফিরে এসেছিলো আমার খোঁজে। আমি শ্যামলের কথা শুনছিলাম আর মনে মনে ভাবছিলাম– শুধু আমি একাই এসব ভাবি না। ওরাও আমার কথা ভাবে। আন্টি জানালেন, এটা মনের টান। দুইজন সারাদিন একসাথে খেলতি, ঘুরে বেড়াতি। একসাথে কতদিন আমাদের বাসায়ও ঘুমিয়েছিস দুজন। আন্টি খাবারের জন্য ডাকলেন। আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছিলো। আন্টির সামনে আমি ও শ্যামল একসাথে খাবার খেতাম।

আন্টি খুব আদর করতেন আমাকে। এতটা বছর পরও খুব অদ্ভুত রকমভাবে তিনি আগের মতোই রয়ে গেছেন। আমি যেন তার কাছে ছেলেবেলার সেই ছোট্ট আরিফ। আমার চোখে জল টলমল করছিলো, তা আড়াল করতে তাড়াতাড়ি ওয়াশরুমে চলে গেলাম। আন্টির হাতের রান্না আবারও আমার ভাগ্যে জুটলো। এরপর শ্যামলের সাথে বসে আড্ডা। আন্টি চা নিয়ে আসলেন। আমি বেশ অবাকই হলাম। আন্টি এখনো এতটা সাবলীল কীভাবে! আমার সাথে প্রায় পনের বছর পর দেখা। অথচ কী আন্তরিক ব্যবহার, ঠিক ছেলেবেলার মতোই! আসলে মায়েরা এমনই হয়। আন্টি সব সময় বলতেন, আমার দুই ছেলে শ্যামল ও আরিফ। আন্টির এ ব্যবহারে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে যায়, আমি ভীষণ মুগ্ধ হয়েছিলাম সেদিন। আমার জামালপুরে ছুটে আসা স্বার্থক মনে হচ্ছিলো।

রাতের ট্রেনেই আমাকে ঢাকা ফিরতে হবে, পরদিন অফিস খোলা। আমি বিদায় নিয়ে রওনা হবো, আন্টি ও শ্যামল আমাকে একটা দিন থাকার জন্য অনেক অনুরোধ করেছিলেন। তবে আমি থাকতে পারিনি। ফিরে আসার সময় আন্টির চোখে জল দেখে আমিও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলাম না। আন্টি তা বুঝতে পারছিলেন। চোখের জল মুছে বিদায় নিলাম। আন্টি আমাকে আবারও আসার জন্য অনুরোধ করলেন, আমিও কথা দিয়েছিলাম– আসবো।

রেলস্টেশনে যাওয়ার সময় সময়ে জাহেদা সফির মহিলা কলেজের সামনে রিকশা থেকে নামলাম। এ এলাকায় আমরা কিছুদিন ভাড়া ছিলাম। চারপাশে তাকিয়ে দেখছিলাম, অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ভিডিও গেমসের দোকান থেকে একটি ছেলেকে বের হতে দেখে মনে হলো ছেলেটি উৎপল। ছোটবেলার চেহারার সাথে অনেকটা হুবহু মিল। আমাকে দেখে উৎপলও বারবার তাকাচ্ছিলো। আমি উৎপল বলে ডাকলাম তাকে। উৎপল কাছে এসে বললো, আপনাকে খুব চেনা চেনা লাগছে। আমি নিজের পরিচয় দিলাম। সে এতটাই খুশি হলো যে, কথা না বলে আমার দিকে কিছুক্ষণ কেবল তাকিয়েই রইলো এবং জানালো, 'এজন্যই তো এত চেনা চেনা লাগছিলো তোকে।'
আমরা দুজন একসাথে চা পান করলাম। ওর সাথে আলাপচারিতায় বুঝলাম সে আগের মতোই চঞ্চল ও চটপটে রয়ে গেছে। রাজনীতি করে। ওর কাছে বিদায় নিয়ে রেলস্টেশনের উদ্দেশে আবারও পা বাড়ালাম। আমার জামালপুরের ভ্রমণটা এবার যেন ষোল-আনা পূর্ণতা পেল!

ট্রেনের একটানা দুলুনিতে ঘুম ঘুম লাগছিলো। দুচোখ বন্ধ করে মনে মনে ভাবছিলাম– কী যাদুমন্ত্রের মতো ট্যুরটার সমাপ্তি হচ্ছে! আশ্চর্যজনকভাবে শ্যামল ও উৎপলের সাথে দেখা হলো। সৃষ্টিকর্তার লীলা বুঝা সত্যিই দায়! শ্যামল ও আন্টির সাথে কথা বলার জন্য পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করতে গিয়ে দেখলাম পকেটে মোবাইল নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর বুঝতে পারলাম মোবাইলটা আসলে হারিয়ে ফেলেছি। শ্যামলের মোবাইল নাম্বারটা আমার হারিয়ে ফেলা মোবাইলে সেভ করেছিলাম। অর্থাৎ শ্যামলের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম

আমি হারিয়ে ফেললাম! হঠাৎ বজ্রপাতের শব্দে সোনালি অতীতের স্মৃতির রাজ্য থেকে আমার বাড়ির জানালার পাশে নিজেকে আবিষ্কার করলাম। বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণই নেই। আমি আবারও স্মৃতির রাজ্যে ফিরে গেলাম...

ছয় মাস পর আবারও জামালপুরে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিলো আমার। এবার উপলক্ষ ছিলো জামালপুরের বেলটিয়া নামক স্থানে এক দূরসম্পর্কের চাচার বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। শ্যামল ও আন্টির সাথে আবার দেখা হবে সে কারণে জামালপুরে যাওয়ার ব্যাপারে আমি ভীষণ উৎফুল্ল ছিলাম এবং অনুষ্ঠানের একদিন আগেই গিয়েছিলাম সেখানে। ঐদিনই আমি বন্ধু শ্যামলদের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হই। বিয়ের অনুষ্ঠানস্থল বেলটিয়া থেকে খুব বেশি দূরে না শ্যামলদের বাড়ি। আসলে আন্টিকে কথা দিয়েছিলাম আবারও আসবো। তাই মূলত আন্টির সাথে দেখা করতেই গিয়েছিলাম আমি। আন্টির জন্য একটি শাড়ি ও জায়নামাজ নিয়েছিলাম। খুব আনন্দ হচ্ছিলো আমার মায়ের মতো আন্টিকে আবার দেখতে পাবো।

শ্যামলদের বাসার সামনে উপস্থিত হয়ে ওর নাম ধরে কয়েকবার ডাকলাম। আমার মনে ভীষণ আনন্দ! আবার শ্যামল ও আন্টির সাথে দেখা হবে। দরজা খুললেন একজন অপরিচিত ভদ্রমহিলা। আমি জিজ্ঞেস করলাম,
– শ্যামল নেই?
– আপনি কে? আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন তিনি।
– আমি আরিফ, শ্যামলের বন্ধু। শ্যামলকে একটু ডাকবেন প্লিজ?
– শ্যামল তো কোরিয়া থাকে। আপনাকে তো আগে দেখিনি, আপনি কোথায় থাকেন?
– আমি বেশ অবাকই হলাম। ছয়মাসও তো হলো না। শ্যামল এর মধ্যেই বিদেশ চলে গেল। মোবাইলটা হারিয়ে ফেলায় গত ছয়মাসে শ্যামলের সাথে আর কোনো যোগাযোগও করতে পারিনি আমি। ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম– আন্টি আছেন?
তিনি আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আমি বিব্রতবোধ করছিলাম। আবারও প্রশ্ন করলাম, আন্টি মানে শ্যামলের মা বাড়িতে আছেন?
– আমিই তো শ্যামলের মা। আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম! চারপাশে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, ভুল জায়গায় চলে আসিনি তো! কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।
ভদ্রমহিলা আমাকে ভিতরে আসতে বললেন। আমি বুঝতে পারছিলাম না, কি করবো। তিনি খুব অনুরোধ করলেন আমাকে বাড়ির ভিতরে যাওয়ার জন্য। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। ছয়মাস পূর্বে আমি যেখানে আন্টির সাথে বারান্দায় বসে কথা বলেছিলাম, এটা তো সেই জায়গা! ভিতরে শ্যামলের চাচাকেও দেখতে পেলাম। আমি যেন গোলকধাঁধায় পড়ে গেলাম!
– আমার মুখ থেকে বের হয়ে গেল, 'আমি তো ঠিক জায়গাতেই এসেছি। আন্টি কোথায়? আপনি তো শ্যামলের মা নন।'
– শ্যামলের আম্মা দুই মাস আগে মারা গেছেন। আমি শ্যামলের ছোট মা, খুব শান্তভাবে জানালেন ভদ্রমহিলা।

কথাটা শুনতে আমি কোনোরকম প্রস্তুতই ছিলাম না। মনে হলো আমি যেন ৪৪০ ভোল্টের ইলেকট্রিক শক খেলাম। যেন পুরো পৃথিবীটা আমার উপর ধ্বসে পড়েছে। কোনোভাবেই চোখের জল আটকিয়ে রাখতে পারিনি। আমার দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়া অশ্রুর ফোঁটা আন্টির জন্য নিয়ে আসা জায়নামাজের ওপর পড়ছিলো। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছিলো। মনে মনে ভাবছিলাম, কেন আরো দুইটা মাস আগে আসতে পারলাম না। আন্টিকে দেয়া কথা রেখেছি, আবার জামালপুরে এসেছি, কিন্তু বড় দেরিতে! বড় অসময়ে!! এক বুক কষ্ট নিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করে সেদিনই ঢাকায় ফিরে এসেছিলাম। এরপর আর কখনোই জামালপুরে যাওয়া হয়নি আমার।

বজ্রপাতের শব্দে কল্পনার রাজ্য ছেড়ে বাস্তবের বৃষ্টিমুখর দুপুরে ফিরে এলাম। এ মুহূর্তে বৃষ্টি কিছুটা কমেছে, হয়তো পুরোপুরি থেমে যাবে একসময়। কিন্তু আমার মনের গহীনে নীরবে শ্রাবণের অঝোর ধারার মতো মুষলধারে যে বৃষ্টি পড়ছে, তা কবে থামবে জানা নেই...

ফটো অ্যালবাম

ব্যাবিলন কথকতার ১৫তম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচনী উৎসবের বিশেষ ক্ষণে প্রধান অতিথি বিশিষ্ট সাহিত্যানুরাগী জনাব ইলাহী দাদ খান এবং ব্যাবিলন গ্রুপের পরিচালকবৃন্দ।

বগুড়ার মম ইন রিসোর্টে ব্যাবিলন এগ্রিসাইন্স লিমিটেড এবং ব্যাবিলন এগ্রো অ্যান্ড ডেইরি লিমিটেড এর 'মিট দি টার্গেট' অধিবেশনের বিশেষ মুহূর্তে পরিচালকবৃন্দ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরীতে অংশীদারিত্ব বুঝে নিতে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করছেন ব্যাবিলনের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

অবনী নীট ওয়্যার লিমিটেড কর্তৃক আয়োজিত 'আই ক্যাম্প' এ লায়ন্স ক্লাবের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক একজন শ্রমিকের চক্ষু পরীক্ষা করছেন।

কৃষি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়
ব্যাবিলন সীড

BABYLON

www.babylonagrodairy.com

www.facebook.com/Babylon Agro and Dairy Ltd

BABYLON TRIMS LIMITED

(A Concern of Babylon Group)

Our Products:

- Auto Carton Box
- Manual Carton Box
- Poly Bag
- Recycle Poly Bag
- Zip Lock Poly Bag
- Gum Tape
- Back Board
- Neck Board
- Plastic Clip
- Collar Insert
- Butterfly
- Tie Bed
- Photo Inlay
- Hang Tag
- Price Ticket
- Boxes
- Cascade
- Wrap Band
- Barcode Sticker
- Carton Sticker
- Size Sticker
- Tissue Paper
- Printed Label

Compliance Certificate

- Walmart Social Compliance
- FSC Certificate
- Oeko-Tex
- Alliance
- Wrap Certificate

Office & Factory :
Kandi Boilarpur, Horindhara
Hemayetpur, Savar
Dhaka-1340, Bangladesh.
Tel : 9609003304

Marketing Office :
House-28 (1st Floor)
Road-6/B, Sector-12, Uttara
Dhaka, Bangladesh.
E-mail : btlmarketing@babylon-bd.com

Corporate Office :
2-B/1, Darussalam Road, Mirpur
Dhaka-1216, Bangladesh.
Tel: 9023495-6, 9025495, 9023460,
9023462-63, 9007175,9010533, 8011089
Fax: 880-2-8015128

Web: www.babylongroup.com

NEWGEN TECHNOLOGY LTD
BABYLON RESOURCES LTD

B2B

- HR and Payroll Management System
- Merchandising Management System
- Production Management System
- Inventory Management System
- Babylon Payment Automation System (BPAS)
- LC Management System (LCM)
- Cash Incentive Management System

B2G

- Software Development
- Apps & Games Development
- Government Training

B2C

- LearnersCafe
- DAR – Daily Activity Report
- EventBy
- UNLOCK – Video Conferencing Solution

Training

- Database
- Security
- Programming
- Networking
- Digital Marketing
- Graphics Design

Games & Apps

- GPS71
- 1MinuteJobs
- Secret Lab
- Castle Traps

We became Champion in Indigenous Service Category of Basis National ICT Award for 'Learnerscafe' in 2019.

We became Champion in Supply Chain Category of Basis National ICT Award for 'Prottay ERP' in 2018.

Floor–7A, House 3/1, Block F, Lalmatia,Mohammadpur, Dhaka 1207 +88 (02) 9015165, 9015348, +8809609003306 www.brlbd.com www.newgen-bd.com

Corporate Office:
2-B/1, Darussalam Road, Mirpur, Dhaka-1216, Bangladesh
Tel : +8809609003300
E-mail : babylon@babylon-bd.com
Web : www.babylongroup.com
www.babylonkathokata.com